ঐকতান
OIKOTAN

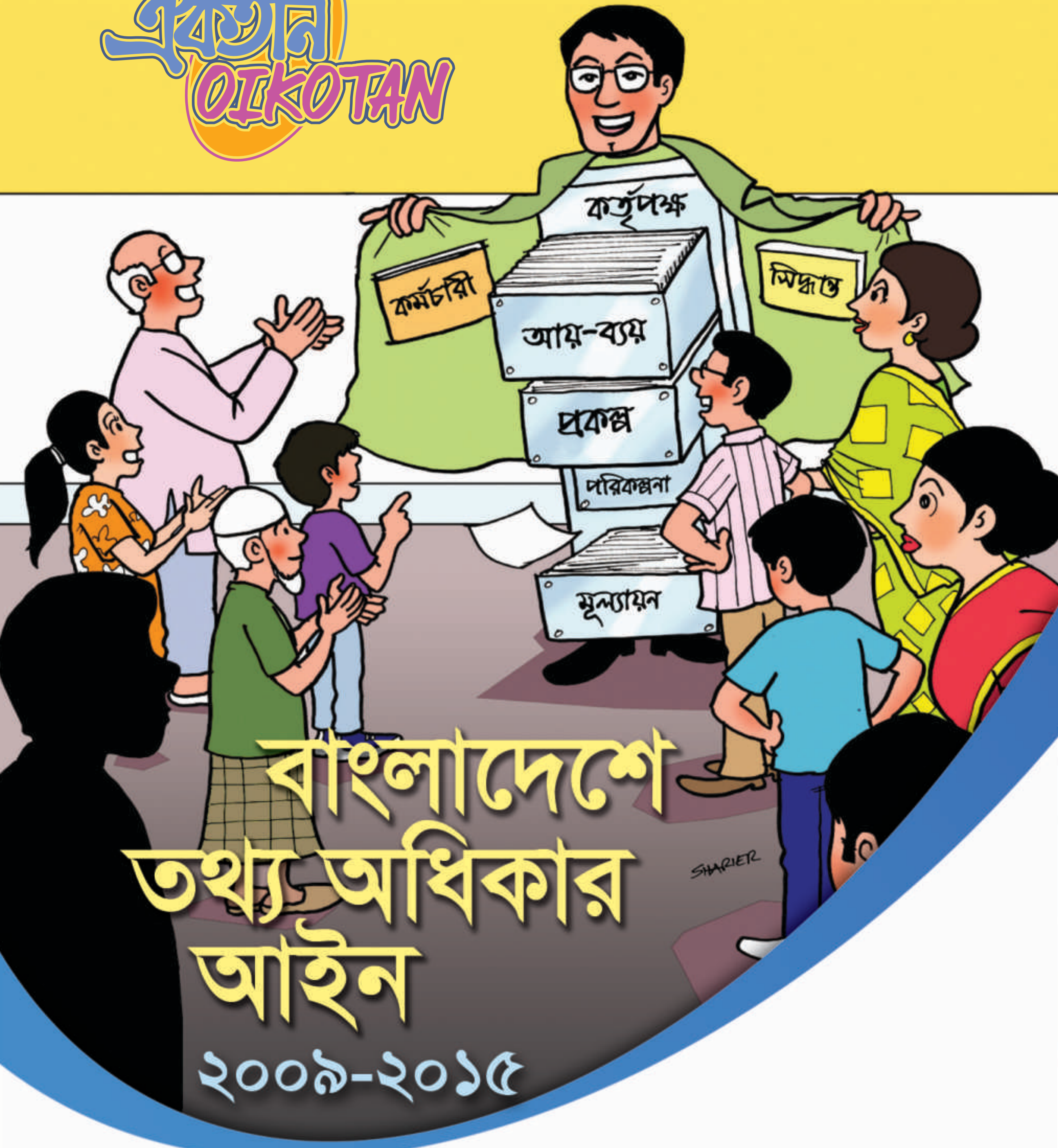

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন

২০০৯-২০১৫

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

ঐকতান
OIKOTAN

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-২০১৫

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

বিশেষ সংখ্যা ।২০১৫

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-২০১৫

সম্পাদক

শাহীন আনাম

সার্বিক সহযোগিতা

মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

নিউজলেটার ইনচার্জ

শাহানা হুদা, কোঅর্ডিনেটর, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন

ছবি

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও এমআরডিআই এর সংগ্রহ থেকে

ডিজাইন ও প্রিন্ট

অর্ক

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ চালু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ৬ বছর পার হয়েছে। এই আইনটি পাস হওয়ারও অনেক আগে থেকেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার জন্য একটি আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি বেসরকারি সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা ও বিভিন্ন পেশাজীবীরা কাজ শুরু করেছিল। চেষ্টা করেছে এমন একটি শক্ত ভিত্তি রচনা করার যেন আইন প্রণয়নের কাজটি সহজ হয়।

এই তথ্য অধিকার আইন শুধু নিছক একটি আইন নয়। সরকার, বিদেশি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি সংস্থা, দেশি এনজিওদের কাছ থেকে তথ্য জানা ও পাওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এই আইন। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন জনগণ জানতে পারবে তাদের ন্যায্য পাওনা কী কী, সেই পাওনা কি তারা পাচ্ছে, যদি না পায় কেন পাচ্ছে না, কে তাদের বঞ্চিত করছে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব তারা খুব সহজেই পেতে পারে এই আইন ব্যবহার করে। এসব প্রশ্নের উত্তর জানার মাধ্যমে জনগণ তাদের অন্যান্য অধিকারও সংরক্ষণ করতে পারবে।

সেইসঙ্গে সরকার এবং অন্যান্য তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলো জনগণকে তাদের সম্পর্কে তথ্য দিয়ে বা তথ্য দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে নিজের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। আর যখন কোনো সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা সরকারি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো প্রকাশিত হয়, তখন দুর্নীতির হার ও দুর্নীতি করার সুযোগ দুই-ই অনেক কমে যায়।

তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর প্রায় আধা যুগ পার হয়ে গেলেও আমরা এখনো এই আইনের কাঙ্ক্ষিত ফল পাইনি। অনেকেই বলে যে আমাদের দেশে যেহেতু আইনটি সুশীল সমাজ, এনজিও, পেশাজীবী সংগঠন ও সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের দাবি ও আন্দোলনের ফল, সেহেতু গণমানুষের কাছে আইনটি কখনই গ্রহণীয় হয়ে ওঠেনি। আর তাই সাধারণ মানুষ জানেইনা কেন এবং কার জন্য এই আইন?

অনেকেই মনে করতো এবং এখনো ভুল ধারণা পোষণ করে যে তথ্য অধিকার আইন মনেহয় শুধু সাংবাদিকদের আইন। তবে একথাও ঠিক যে এই আইন ব্যবহার করে সাংবাদিকরা অনিয়ম, দুর্নীতি ও জনহিতকর প্রকল্প নিয়ে আরো বেশি বেশি করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেন। সেইসাথে তুলে ধরতে পারেন তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ও এর সফলতা, দুর্বলতা, ফলাফল, আপিল, আবেদন, তথ্য পাওয়া, না পাওয়া এরকম অনেক সংবাদ। এর পাশাপাশি গড়ে তুলতে পারেন তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহারের পক্ষে শক্তিশালী প্রচারণা। আমরা আশা করবো, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আমাদের গণমাধ্যম আরো জোরালো ও সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। তারা চাহিদাপক্ষ ও কর্তৃপক্ষসমূহের অবস্থান, আইনের প্রয়োগ, তথ্য কমিশনের ভূমিকা, এই বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে। এদেশের নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত, এমনকি শিক্ষিত মানুষদের অনেকেই ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেনি এই তথ্য অধিকার আইন কী, কেন এবং কাদের জন্য? সাধারণ মানুষ যে কতোভাবে এই আইন দ্বারা উপকৃত হতে পারে, পারে তাদের অধিকার আদায় করতে, এই বিষয়টিও অনেকাংশে অজানা থেকে গেছে। গণমাধ্যম ব্যাপকভাবে পারে তাদের প্রচারনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে এই তথ্য তুলে ধরতে।

সরকার খুব উদার মনে মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য জনহিতকর এই আইনটি প্রবর্তন করেছে এবং বাস্তবায়নের জন্যও ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এরপরও দেখা যাচ্ছে, আইনটির ব্যাপক প্রচার ও ব্যবহার ঘটছে না। আইনটি ব্যবহার করা নিয়ে চাহিদাপক্ষ ও সরবরাহ কর্তৃপক্ষের মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এক ধরনের উৎসাহের ঘাটতিও লক্ষ করা গেছে। সরকার আইনটি করেছে ঠিকই কিন্তু সরকারের সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর অনেকেই তথ্য দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহী নয়। এখনো কর্তৃপক্ষের অনেকে জানেই না কী তাদের ভূমিকা, কেন ও কীভাবে তারা তথ্য দেবে? তথ্য দিতে গিয়ে তথ্য কর্মকর্তারা উচ্চপর্যায়ের অনুমতির

অপেক্ষা করে, সহজে মুখ খুলতে চায়না। জনগণ সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা হয়রানির ভয় পায়, ফলে তথ্য জানতে চাওয়ার ক্ষেত্রে তারা উৎসাহবোধ করে না।

এরপরও এই কয়েক বছরে সরকার গঠন করেছে তথ্য কমিশন, হয়েছে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, বহু সরকারি ও বেসরকারি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদের দেয়া হয়েছে প্রশিক্ষণ। তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করছে এরকম বিভিন্ন এনজিও তাদের কাজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে, পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে এই আইন সম্পর্কে তথ্য, প্রশিক্ষণ এবং নানা ধরনের সহযোগিতা দিয়ে সচেতন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যেন মানুষ এই আইনটি সম্পর্কে জানে এবং এর সুফল ভোগ করার মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায় করতে পারে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন একদম শুরু থেকেই তাদের সহযোগী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে তথ্য অধিকার আইনের খসড়া প্রণয়ন, খসড়াকে আইনে রূপদানের দাবি জানানো, সেই দাবী আদায়ের সংগ্রাম, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যোগাযোগসহ নানা ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এখনও বাস্তবায়ন পর্যায়ে যুক্ত আছে। এই বিশেষ নিউজলেটারটিতে আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক এর ইতিহাস, বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রেক্ষিত, পর্যায়, বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক, আইন নিয়ে আশা নিরাশা, এর ব্যবহার, তথ্য কমিশন, তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা কী ও কেন, সরকার কীভাবে আইনটি প্রয়োগ করছে, তথ্য অধিকার ফোরাম কী, দুর্নীতি ঠেকাতে এই আইনের ভুমিকা ইত্যাদি সবকিছু। তথ্য অধিকার আইনের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছ থেকে লেখা পেয়েছি আমরা। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য।

আমরা আশা করছি, আমাদের সবার এই মিলিত উদ্যোগের ফলে আমরা পারবো তথ্য অধিকার আইনের মতো এতো জনকল্যাণমূলক একটি আইনের সুফল ঘরে তুলতে।

Shaheen Anam

শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ ৭
নেপাল চন্দ্র সরকার

কীভাবে জনপ্রিয় হতে পারে তথ্য অধিকার আইন ১৮
সুরাইয়া বেগম

তথ্য: রুদ্ধ ও মুক্ত ২৬
মনজুর হাসান

স্বচ্ছ সরকার ও তথ্য অধিকার ২৮
শাহীন আনাম

তথ্য অধিকার, ইতিহাস থেকে নেয়া ৩১
হামিদুল ইসলাম হিল্লোল

তথ্য অধিকার অভিযাত্রা ৩৫
ব্যারিস্টার তানজীবউল আলম

নারীর ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার ৩৮
অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

তথ্য অধিকার আইন: তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ৪৫
মো. মুস্তাফিজুর রহমান

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯: প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রেক্ষিত ও পদক্ষেপ ৪৮
সানজিদা সোবহান

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯: তথ্য প্রদানের ব্যতিক্রমসমূহ (ধারা ৭) ৫৩
ধারণা জরিপ থেকে পাওয়া সুপারিশসমূহ

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ৬৯
নেপাল চন্দ্র সরকার

তথ্য অধিকার আইন: জনগণের আইন শক্তিশালী আইন ৭৬
ফরিদ হোসেন

তথ্য অধিকার ফোরাম কী ও কেন ৮০

সরকারি কাজের ওপর সাধারণ মানুষের নজরদারি ৮২

তথ্য অধিকার আইন: এমজেএফ ও এর সহযোগীরা কী করছে ৮৫
মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন

তথ্য অধিকার আইন: একজন সরকারি কর্মকর্তা কীভাবে দেখেছেন ৮৯
শরীফ নজরুল ইসলাম

সাধারণ মানুষের অন্যতম হাতিয়ার "তথ্য অধিকার আইন" ৯১
মোঃ মাহমুদ হাসান রাসেল

কিছু সফল বাস্তবায়নের চিত্র ১০১

সবাই যেন তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ১০৩
রুহি নাজ

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ১০৫

তথ্য প্রকাশ নীতি: সরকার খুলে দিল দ্বার, দিন ফুরালো বন্ধ তালার ১০৭

মানুষকে যদি জানানো যায় যে তাদের দেয়া করের টাকায় কি কি কাজ হচ্ছে, তাহলে মানুষ কর দিতে উৎসাহিত হবে। মানুষ কর দিতে চায় না, এ কথাটি ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে জনগণ তাদের করের টাকার কোন হিসাব পায়না বলে, কর দিতে নিরুৎসাহিতবোধ করে।

তথ্য নেবো তথ্য দেবো
দেশ গড়ায় অংশ নেবো

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ

নেপাল চন্দ্র সরকার
তথ্য কমিশনার

জনকল্যাণে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে মানুষ কী চায়? এর উত্তরটা খুব সহজ। মানুষ ওইসব প্রতিষ্ঠান থেকে সম্ভাব্য সবচেয়ে কম সময়ে ঝামেলাহীনভাবে এবং দুর্নীতি ও অনিয়ম ছাড়া সেবা পেতে চায়।

জাতীয় সংসদে ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' পাস হয়। সাংবিধানিক, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ, অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি সহায়তায় পরিচালিত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে জনগণের ক্ষমতায়ন ও সময়মতো সেবা পৌঁছে দেওয়া এই আইন প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। আইনটি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর হয় ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল। এ আইনটির বলে নাগরিকরা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ ও সরকারি বা বিদেশি সহায়তায় পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য চাইতে পারে। এটা আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয় যে, সরকার আমাদের এমন একটি আইন দিয়েছে যার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এর মাধ্যমে নাগরিকের জন্য সরকারি সেবার ক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাসের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নিচের বিষয়গুলোর ভিত্তিতে গত ছয় বছরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই তথা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে:

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ডিও) নিয়োগ
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, বিধিবিধান নিয়ে প্রশিক্ষণ
- তথ্য চেয়ে আবেদন, প্রদান ও প্রত্যাখ্যান

"তথ্য" অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় তৈরী যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা তাদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, ধারা ২(চ)

- আপিল আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি
- অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি
- কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদান
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট তৈরি এবং মেনে চলার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ জনসচেনতামূলক কর্মসূচি
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সাংবাদিকতায় ব্যবহার
- সার্বিক পর্যবেক্ষণ
- প্রতিবন্ধকতা এবং
- আইন সফল বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি অফিস বা দপ্তর ৬০ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহকারী ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) নিয়োগ দিতে বাধ্য। তথ্য কমিশনের সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ২০১৪ সাল পর্যন্ত ২০ হাজার ১৩৬ জন ডিও নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ১৬ হাজার ৩৮৭ জন কর্মকর্তাকে এবং ৬৬৪টি বেসরকারি সংগঠনে (এনজিও) তিন হাজার ৭৬৯ জনকে ওই পদে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য এবং মহা হিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয়ের দেওয়া তথ্য অনুসারে, দেশে মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি অফিসের সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৫ হাজার। আর ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকার পরিষদের অফিসের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। সে হিসাবে সরকারি পর্যায়ে ৫৫ শতাংশ অফিসে এ যাবত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

অবশিষ্ট ৪৪ শতাংশ সরকারি অফিসে এখনও এই কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এনজিও ব্যুরোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে সরকারি এবং বিদেশি সহায়তায় পরিচালিত এনজিওর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এর মধ্যে মাত্র ৬৬৪টি এনজিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে পেরেছে। অর্থাৎ এনজিওগুলো মাত্র ২২ শতাংশ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছে। এসব এনজিওর সব স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার হিসাবটি বের করা খুবই মুশকিল। কেননা এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকেরই উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সব স্তরে কোনো অফিস নেই। সারণি-১ এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বছরওয়ারী চিত্র তুলে ধরা হলো।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, মন্ত্রণালয় থেকে অধিদপ্তর পর্যায়ে শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে অধিদপ্তরের নিচ থেকে জেলা পর্যায় এবং সেখান থেকে উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার হার ক্রমান্বয়ে কমেছে। যদিও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ১০ (১) ধারা অনুযায়ী প্রতিটি তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে এই কর্মকর্তা নিয়োগ

সারণি-১

বছর	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০১০	৪৬১৬	১১৩৪	৫৭৫০
২০১১	৩২২২	১৩৩৮	৪৫৬০
২০১২	২২৪৬	৬১৩	২৮৫৯
২০১৩	৪৫২৯	৫৩৮	৫১১২
২০১৪	১৭৭৪	১০১	১৮৫৫
মোট	১৬৩৮৭	৩৭৬৯	২০১৩৬

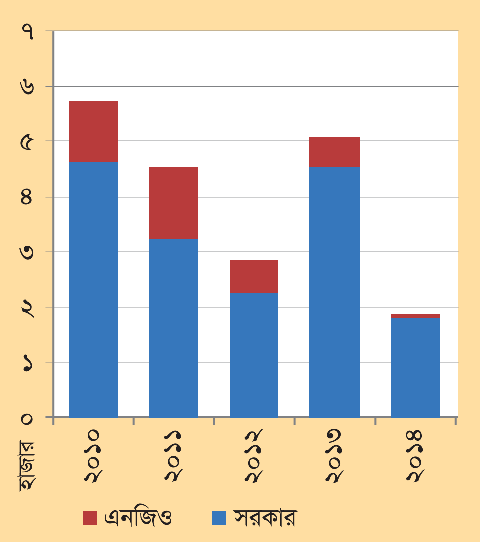

দেওয়া বাধ্যতামূলক। কাজেই অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যেসব অফিসে এখনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়নি সেসব জায়গায় এই কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশনের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সরকারি এবং এনজিও মিলিয়ে ১৩ হাজার ৫২৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন এবং বিধিবিধানের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় দেওয়া এসব প্রশিক্ষণে মোট

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রায় ৬৭ শতাংশের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি অফিসের এক হাজার ৩৪ জন কর্মকর্তা, ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের ১৬২ জন শিক্ষক, বিভিন্ন সংবাদপত্রের এক হাজার ৩৪ জন সাংবাদিক এবং সহ-সম্পাদককে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং সরকারি বিভিন্ন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তথ্য কমিশনের কার্যালয়ে। জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে জেলা সদর এবং আটটি উপজেলা সদরে। সারণি-২ এ বিভিন্ন বছরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি-২

বছর	প্রশিক্ষণ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা	মন্তব্য
২০১০	১৫২	মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
২০১১	২০৯৪	মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
২০১২	২০৬৭	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
২০১৩	৪১৮৭	এর মধ্যে ৯৪ জন শিক্ষক, ৪৫৮ জন সাংবাদিক, ১৩২ জন সহ-সম্পাদক এবং সরকারি অফিসের কর্মকর্তারা রয়েছেন
২০১৪	৭৬০১	এর মধ্যে ৬৮ জন শিক্ষক, ৫৬৮ জন সাংবাদিক, ২২১ জন সহ-সম্পাদক এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা

তথ্য কমিশন ও প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতিটি প্রশিক্ষণই আয়োজন করা হয়েছে হয় কমিশনের কার্যালয়ে নয়তো বিভিন্ন জেলায়। এখন উপজেলা পর্যায়ে এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা জরুরি যাতে এ পর্যায়ের কর্মকর্তারাও তথ্য অধিকার আইনটির বিষয়ে জানতে পারেন। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং আপিল কর্তৃপক্ষের জন্যও আলাদাভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা দরকার। তথ্য অধিকার আইন নিয়ে প্রশিক্ষকের ঘাটতি আছে। তাই তথ্য কমিশনে ৪৯৮ জন সরকারি কর্মকর্তা, এনজিওকর্মী, সাংবাদিক এবং আইনজীবীকে প্রশিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ (টিওটি) দেওয়া হয়। প্রতিটি জেলার জন্য ৬ জন এবং প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য দুইজন করে প্রশিক্ষকের একটি দল তৈরির জন্য এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নয়টি ধাপে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে যারা অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন তাদের সারা দেশের জন্য তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক নির্বাচন করা হয়।

৩. তথ্য চেয়ে আবেদন, গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান

তথ্য কমিশনের ২০১০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, পাঁচ বছরে তথ্য চেয়ে সারা দেশের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৬৯ হাজার ৮৬২টি আবেদন পড়েছে। এর মধ্যে ২০১০ সালে পড়েছে, ২৫ হাজার ৪১০, ২০১১ সালে সাত হাজার ৮০৮, ২০১৩ সালে ১৬ হাজার ৪৭৫ এবং ২০১৪ সালে আট হাজার ৪৪২টি আবেদন। বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১০ সালের অনুরোধগুলোর মধ্যে মৌখিক অনুরোধ যুক্ত আছে। তবে পরের বছরগুলোতে আর মৌখিক অনুরোধকে এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে পরের বছরগুলোতে আবেদনের সংখ্যা কমে গেছে। পাঁচ বছরে তথ্য চেয়ে করা আবেদনের মধ্যে মাত্র দুই হাজার ৪৩৭টি আবেদন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা প্রত্যাখ্যান করেন। এটা মোট আবেদনের মাত্র ৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ। চিত্র-১ এ বছরভিত্তিক আবেদনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র-১

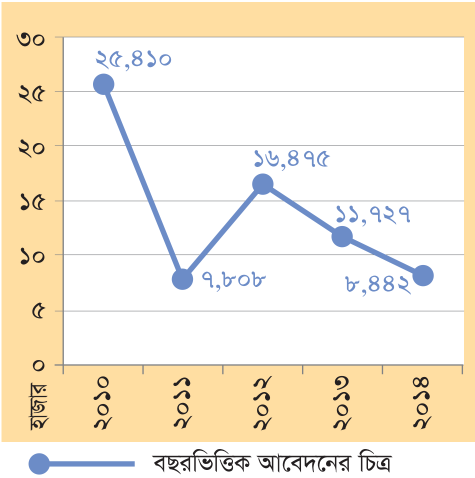

১৬ কোটি মানুষের এদেশে পাঁচ বছরে ৬৯ হাজার ৮৬২টি আবেদন খুবই কম বলা যায়। জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে এটি দাঁড়ায় জনপ্রতি ০.০৪৪ শতাংশ। জনগণের অধিকারসম্বলিত এই আইন সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে ধারণার অভাবই এতো কম আবেদন পড়ার মূল কারণ। পাঁচ বছরে এই আইনটি ব্যবহার করার প্রবণতা কখনো কমেছে কখনো বেড়েছে। ২০১৪ সালে আবেদন কম পড়ার একটি কারণ হলো, এই সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও তথ্য অধিকার আইনে উল্লিখিত অধিকার নিয়ে ব্যাপক আকারে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। এর মধ্যে থাকতে পারে উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ সভা। তথ্য কমিশনের উচিত আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশের ৪৮৭টি উপজেলাতেই আইনটি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সভা আয়োজনের একটি সময়সূচি ঠিক করা।

৪. আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন দায়ের ও নিষ্পত্তি

তথ্য কমিশনের ২০১০ এবং ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য না পেয়ে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে ঠিক কতোগুলো আবেদন পড়েছে তার সংখ্যা নেই। তবে ২০১২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই বছরে তথ্য চেয়ে করা ১৬ হাজার ৪৭৫টি আবেদনের মধ্যে ৬৭৬টি প্রত্যাখ্যাত হয়। আর এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দপ্তরে ৪২টি আপিল আবেদন দায়ের করা হয়। এর মধ্যে ৩৯টি আবেদন নিষ্পত্তি হয় এবং তিনটি আবেদন নিষ্পত্তি হয়নি। মোট আবেদন এবং প্রত্যাখ্যানের বিপরীতে আপিলের শতকরা হার যথাক্রমে ০ দশমিক ২৫ শতাংশ এবং ৬ দশমিক ২১ শতাংশ। তথ্য কমিশনের ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সেই বছর করা ১১ হাজার ৭২৭টি আবেদনের মধ্যে মাত্র ৪৫২টি আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এর মধ্যে ৬৫টির বিষয়ে আপিল করা হয়েছে। এই ৬৫টি আপিলের মধ্যে ৫২টির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ১৩টি হয়নি। মোট আবেদন এবং প্রত্যাখ্যানের বিপরীতে আপিলের শতকরা হার যথাক্রমে ০ দশমিক ৫৫ শতাংশ এবং ১৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ। ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সে বছর তথ্য চেয়ে মোট আবেদন পড়েছে মোট আট হাজার ৪৪২টি। এর মধ্যে মাত্র ৫৪২টি আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এর বিপরীতে দেশের বিভিন্ন স্থানে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পড়েছে ৯১টি। এর মধ্যে ৭৯টি আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে, অনিষ্পন্ন রয়েছে ১২টি। মোট আবেদন এবং প্রত্যাখ্যানের বিপরীতে আপিলের শতকরা হার যথাক্রমে ১ দশমিক ০৮ শতাংশ এবং ১৬ দশমিক ৭৯ শতাংশ। প্রত্যাখ্যান এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আপিল আবেদনের হার চিত্র-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

চিত্র-২

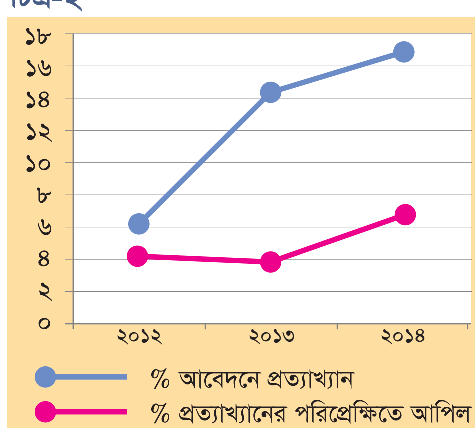

প্রত্যাখ্যানের বিপরীতে প্রতি বছর আপিল আবেদনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার চিত্র থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হচ্ছে যা একটি ইতিবাচক বিষয়।

৫. অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি

তথ্য কমিশন গঠনের পর থেকে ২০১৪ সালের শেষ পর্যন্ত কমিশনে মোট ৮০৭টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। এর মধ্যে শুনানির জন্য ৪৭৭টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। শুনানির পর নিষ্পত্তি হওয়া মামলার সংখ্যা ৪৬৩টি। শুনানির আগেই ৩৩০টি চিঠি পাঠিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়। আর মাত্র ১৪টি অভিযোগ অনিষ্পন্ন রয়েছে। নিষ্পত্তি হওয়া অভিযোগগুলোর মধ্যে মাত্র ২২টি অভিযোগ একেবারে খারিজ করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ মোট নিষ্পন্ন অভিযোগের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশের ক্ষেত্রেই (৪৪১টি) কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

চিত্র-৩ এ তথ্য কমিশনে আসা বছরওয়ারী অভিযোগের তথ্য দেওয়া হয়েছে।

তথ্য কমিশনে আসা অভিযোগগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নানা বিষয় এর মধ্যে এসেছে। এর মধ্যে আছে খাস জমিসহ পাহাড়ি জমি, জলাভূমির ইজারা, জমি নিবন্ধন, রাজউকের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য, কৃষি-মৎস্যসম্পদ-স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, রাজস্ব বিভাগ, বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, পরীক্ষা, বিজ্ঞাপন, সরকারি আদেশ, দুর্নীতি, এনজিও, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

চিত্র-৩

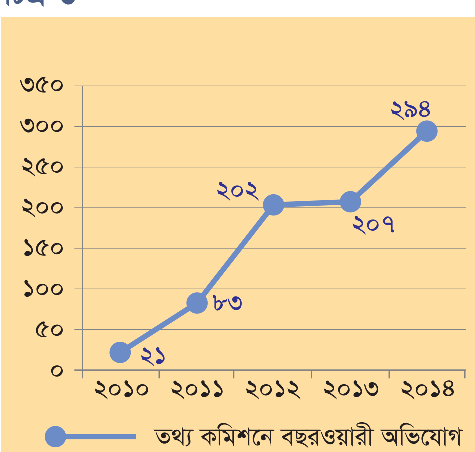

দেখা গেছে, শুনানির জন্য গৃহীত অভিযোগের মধ্যে ৯৫ শতাংশের ক্ষেত্রেই আবেদনকারীকে তথ্য দেওয়া হয়েছে। তবে শুনানির আগেই বিভিন্ন ধারায় নির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে প্রায় ৪১ শতাংশ অভিযোগের নিষ্পত্তি হয় যে হারটি বেশ উঁচু। তবে কমিশনে আসা অভিযোগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাপ্ত ৮০৭টি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করে কমিশন। মোট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এর হার মাত্র ০ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

কমিশনের বিচারিক ক্ষমতা ও সুপারিশ

এখানে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হলো, কমিশনের **বিচারিক ভূমিকা** এই আইনকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরপেক্ষতা এবং দক্ষতা এ ভূমিকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তথ্য কমিশনে আসা অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া আরও সচল করতে আমার সুপারিশগুলো হচ্ছে:

১. ঢাকায় আসা বাবদ ভুক্তভোগীদের থাকা-খাওয়ার খরচ বাঁচাতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুনানি গ্রহণ।

২. শুনানির আগেই নিষ্পত্তি যতোটা সম্ভব বাদ দিতে হবে। কেবল অভিযোগকারীর পক্ষে রায় গেলেই এভাবে অভিযোগ নিষ্পন্ন করা যেতে পারে, অন্যথায় নয়।

৩. স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং দুর্নীতি বন্ধ করে সুশাসন নিশ্চিত করার যে উদ্দেশ্য নিয়ে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত তার বাস্তবায়নে যেকোনো ধরনের আদেশ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না কমিশন।

৬. কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে তথ্য প্রকাশ

তথ্য অধিকার আইনের ৬ নম্বর **ধারা** অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে প্রতি বছর তার নিজের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। যেখানে তাদের

নেওয়া সিদ্ধান্ত, সভার কার্যবিবরণী, গৃহীত কার্যক্রম বা প্রস্তাবিত কর্মসূচির উল্লেখ থাকবে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) সহযোগিতায় তথ্য কমিশন তিনটি মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; মহিলো ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়) এবং এ সব মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা ২৩টি বিভাগ/সংস্থাকে তথ্য অধিকার আইনের বিধিগুলো মেনে চলতে সহায়তা করার উদ্যোগ নেয়। এ সবের মধ্যে ছিল বিশেষ করে সক্রিয়ভাবে তথ্য প্রকাশের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ; সংস্থাগুলোর ওয়েবসাইট তৈরি ও তা হালনাগাদ করা এবং সংস্থাগুলোর জন্য তথ্য প্রকাশ বিষয়ে নির্দেশনা তৈরি করা।

উদ্যোগগুলোর ফলে নিচের বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে:

১. ওই তিন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত ২০ বিভাগ ১৮টি বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেছে এবং পাঁচটি বার্ষিক প্রতিবেদন স্পাইরাল বাইন্ডিং আকারে প্রকাশ করেছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে ডিসেম্বর, ২০১২ সালের মধ্যে এগুলো প্রকাশ করা হয়।
২. একটি ওয়েবসাইট বাদে সব ওয়েবসাইটের উন্নতি ও হালনাগাদ করা হয়; আনুষ্ঠানিকভাবে দু'টি ওয়েবসাইটের উন্নতি/ তৈরি করে চালু করা হয়।
৩. মন্ত্রণালয়গুলো এবং তাদের অধীনস্ত কিছু বিভাগ সক্রিয়ভাবে তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা ইস্যু করে।

তথ্য কমিশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের (এমআরডিআই) সহায়তায় সচিবদের তথ্য অধিকার ওরিয়েন্টেশন বৈঠকের উদ্যোগ নেয়। এতে সরকারের সব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তারাও যোগ দেন। বৈঠকে সবাইকে তথ্য প্রদানকারী ও আপিল কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়। এতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নানা উপায়ে সক্রিয়ভাবে তথ্য প্রকাশের ওপর।

এ ছাড়াও তথ্য কমিশন এমআরডিআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের (কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) অধীনস্ত সব মিলিয়ে ৪২টি বিভাগ/সংস্থাকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর বিধানগুলো মেনে চলতে সহায়তা করার উদ্যোগ নেয়। এসবের মধ্যে ছিল বিশেষ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে সক্রিয়ভাবে তথ্য প্রকাশের বিষয়টি অনুসরণ, সংস্থাগুলোর ওয়েবসাইট তৈরি ও হালনাগাদ করা এবং সংস্থাগুলো ও তার অধীনস্ত কার্যালয়গুলোর তথ্য প্রকাশের বিষয়ে নির্দেশিকা তৈরি করা। এই উদ্যোগের ফলগুলো হলো:

১. সব মিলিয়ে ৪৭টির মধ্যে চার মন্ত্রণালয় এবং ৩৮ বিভাগ/সংস্থা তথ্য প্রকাশ নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রকাশ করে।
২. বেশির ভাগ মন্ত্রণালয় এবং তাদের অধীনস্ত বিভাগ ও সংস্থাগুলো বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
৩. মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ/সংস্থাগুলোর সব ওয়েবসাইটের উন্নয়ন এবং তাতে বিপুল পরিমাণ হালনাগাদ তথ্য আপলোড করা হয়েছে।

ডি-নেট তথ্য কমিশনের সহায়তায় তথ্য অধিকার আইনের বাস্তব ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করে। সেটা বিটিভিতে প্রচার করা হচ্ছে। পাসাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে এটির প্রদর্শনীও হচ্ছে।

আরও কিছুসংখ্যক এনজিও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের উদ্যোগে কিংবা তথ্য কমিশনের সহায়তায় কাজ করছে। এগুলোর মধ্যে আছে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ (আরআইবি), নাগরিক উদ্যোগ, নিজেরা করি, টিআইবি, আইআইডি, ব্র্যাক, ডেমোক্রেসি ওয়াচ, রূপান্তর এবং কিছুসংখ্যক স্থানীয় এনজিও।

৭. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৫ থেকে ২০২১ সালের জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেখানে সরকার ও তথ্য কমিশনের যৌথ উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। ২০১৪ সালে একটি তথ্য অধিকার আইন ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সুনির্দিষ্ট

ইস্যুভিত্তিক সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে। ওই ওয়ার্কিং গ্রুপটি তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনাটি এগিয়ে নেওয়ার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন স্বাধীন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে মূল ভূমিকা পালন করলেও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে সম্মত হয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যেমন: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, তথ্য কমিশন এবং জেলা ও উপজেলার প্রশাসনিক ইউনিটগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে।

তথ্য অধিকার আইন ওয়ার্কিং গ্রুপের দায়িত্ব হলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে কৌশলগত পরিকল্পনায় উল্লেখ করা তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে তা নিশ্চিত করা। ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকের কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হয়। এ গ্রুপের আরেকটি দায়িত্ব হলো ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি স্ট্র্যাটেজির অধীনের তথ্য অধিকার আইন সাব-কমিটিকে তার কাজের বিষয়টি অবহিত রাখা।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে একটি সংস্কার ও সমন্বয় ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি একটি শীর্ষ সংস্থা তথা তথ্য অধিকার আইন ওয়ার্কিং গ্রুপের সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে কিছু ‘বার্ষিক পারফরমেন্স এগ্রিমেন্ট’ স্বাক্ষর করেছে। ২০১৫ সালে চালু হওয়া এই বার্ষিক চুক্তির আওতায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তথ্য অধিকার আইন মেনে চলার অঙ্গীকার করেছে, বিশেষ করে সক্রিয়ভাবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রতিটি জেলার জন্য একটি তথ্য অধিকার আইন উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করেছে। এই কমিটিতে রয়েছেন ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, জেলা তথ্য কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সংগঠন যেমন: জেলা প্রেসক্লাব, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, নারী সংগঠন, এনজিও, সিএসও ইত্যাদির প্রতিনিধিরা। এ ছাড়াও প্রয়োজনে অন্যান্য কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞদের এই কমিটিতে কোঅপ্ট করা যাবে। অন্য কিছুর পাসাপাশি এই কমিটির মূল কাজ হলো জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করা।

৮. গণ সচেতনতা কর্মসূচি

তথ্য চাওয়ার চাহিদার দিকটি শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে তথ্য অধিকার আইনের উপকারিতার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে এই আইন নিয়ে ৬৪ জেলা সদরে ও ১৮ উপজেলা সদরে সভার আয়োজন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গড়ে প্রতিদিন ১২৫ জন তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে এই আইনের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছেন।

তথ্য অধিকার আইনের নির্বাচিত অংশ নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে আগামীর নাগরিকদের এ বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্য। তথ্য অধিকার আইনের বিষয়ে বিশাল আকারে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জনসাধারণকে নিয়মিতভাবে এসএমএস দেওয়া হয় এবং টিভি স্ক্রলেও তা প্রচার করা হয়। এ ছাড়া তথ্য কমিশন এ বিষয়ে তিনটি সচেতনতামূলক প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছে যা বিটিভিতে সম্প্রচারের পাসাপাশি দেশের মফস্বল এলাকায় গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কিংবা এ ধরনের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

সচেতনতামূলক কর্মসূচিগুলো দরিদ্র নারীসহ ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠী, বৃদ্ধ অসমর্থ্য ব্যক্তি, পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র পরিবার, কৃষক ও খামার শ্রমিক, নারী শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন কর্মজীবী শ্রেণির মানুষকে টার্গেট করে তৈরি করা উচিত। এই শ্রেণির মানুষকে উদ্দেশ্য করেই সরকারের বেশির ভাগ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি নেওয়া হয়। কিছু এনজিওর সহায়তায় তথ্য কমিশন নানা উপায়ে জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের বিষয়ে সচেতন করছে। এ সবের মধ্যে রয়েছে:

- সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বাংলায় আরও বেশি অডিও এবং ভিডিও ক্লিপ তৈরি
- সাফল্যের কাহিনীগুলোকে নিয়ে প্রচারণামূলক স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি নির্মাণ
- পোস্টার, লিফলেট ও পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার
- পত্রিকা ও সাময়িকীতে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার
- জনসচেতনতা তৈরির জন্য ইন্টারনেট/সামাজিক

যোগাযোগের নেটওয়ার্ক ব্যবহার
- তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে কর্মশালা, সেমিনার ও পথনাটক আয়োজন
- সব সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর প্রশিক্ষণ মডিউলে তথ্য অধিকার আইনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন, সাংবাদিকতা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সিলেবাসে তথ্য অধিকার আইনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা
- সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার (আরটিআই) আইনের ব্যবহার

আমাদের দেশের বেশির ভাগ সাংবাদিক মনে করেন, তথ্য অধিকার আইন তাদের প্রতিদিনের কাজের জন্য উপযোগী নয়। কারণ, এ আইনের আওতায় তথ্য পেতে ২০ থেকে ৩০ কার্যদিবস লেগে যায়। সাংবাদিকদের কেউ কেউ মনে করেন, এই আইনটি কেবল গভীর ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্যই উপযোগী। কিন্তু সেটা পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ, আইনের ধারা ৯ (৪) অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু গ্রেপ্তার, কারামুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের প্রাথমিক তথ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে।

আর তথ্য সরবরাহের জন্য ২০ থেকে ৩০ কার্যদিবসের বিধানটির মানে এই নয় যে, একেবারে শেষ দিনেই তথ্যটি দেওয়া হবে। সময়সীমাটি সর্বোচ্চ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই আরও আগেও তথ্য সরবরাহ করা হতে পারে। এমনকি তথ্যের জন্য অনুরোধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেও তা দেওয়া সম্ভব হতে পারে যদি কর্তৃপক্ষ সহজে তথ্যটি যোগাড় করতে পারে। এই আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো তথ্য সরবরাহের বিধান রাখার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র দেখা এবং প্রয়োজনীয় অনুলিপি করারও সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে তথ্য অধিকার আইন চালুর আগে ও পরের সাংবাদিকতায় একটি মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। তথ্য অধিকার সব রকমের ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার এবং সেগুলোর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সুযোগ দিচ্ছে। তথ্য অধিকারের এই নতুন যুগে পাঠক/দর্শকেরা সব রকমের তথ্য চাইতে পারেন নিজেদের মতো করে বিশ্লেষণ করে সত্যিটা বের করে নেওয়ার জন্য। অতএব, তথ্য অধিকারের শক্তির বিষয়টি সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের উপলব্ধি করা উচিত এবং এই শক্তিকে তাদের সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো উচিত। এতে সাংবাদিকতার দিগন্ত অবশ্যই পাল্টাবে এবং সমৃদ্ধ হবে।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে এক হাজার ৪০০ জনেরও বেশি সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীকে এই আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেয় তথ্য কমিশন। তবে আইনটি ব্যবহারের কাঙ্ক্ষিত সুফল এখন পর্যন্ত মেলেনি।

- তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে নতুন প্রজন্মকে সচেতন করতে এ বিষয়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিতর্কের আয়োজন করা

৯. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- তথ্যের ওপর নাগরিকদের অধিকার আইনি ভিত্তি পেয়েছে তথ্য অধিকার আইনের (২০০৯) বলে।
- এনজিওগুলোর তুলনায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলা যেতে পারে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বাদে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে প্রায় ৫৫ শতাংশ সাফল্য অর্জিত হলেও তারা সবাই স্পষ্টভাবে জানেন না যে, ওই আইন অনুযায়ী তাদের কী কী দায়িত্ব পালন করতে হবে। তারা এখনো দাপ্তরিক গোপনীয়তা রক্ষার চর্চায় অভ্যস্ত রয়ে গেছেন, তথ্য প্রকাশের বিষয়ে স্বচ্ছতায় অভ্যস্ত হননি।
- এ সময়কালে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ফলে গোপনীয়তার অভ্যাস থেকে সরে এসে স্বচ্ছতার চর্চা শুরুর কিছুটা ইঙ্গিত মিলেছে। কর্মকর্তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে আরও কিছু সময় লাগবে।
- সক্রিয় তথ্য প্রকাশের কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষ করেছে। যেমন: মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনেকগুলো তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবসাইট তৈরি। কিন্তু এসব ওয়েবসাইটের অধিকাংশই পুরোপুরি তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এখনো আইনের বিধান অনুযায়ী তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।

তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি, রোধ করবে দুর্নীতি

তাই এ ব্যাপারে তথ্য কমিশন ও অন্যান্য নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।

- জনগণের একটা বিশাল অংশ এ আইনে তাদের যেসব অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে জানে না। আর যারা জানেন, তারাও তথ্য অধিকার আইনের শক্তি ব্যবহার করার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন। এ বিষয়টি নিয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। এর ফলে বোঝা যাবে এই অনীহার কারণ কী, তারপর তা চিহ্নিত করে চ্যালেঞ্জগুলো জয় করার উপায় মিলবে।

১০. যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়

১. সাধারণ মানুষের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন আইনের ব্যাপারে সচেতনতা/ধারণার অভাব

২. কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের অভাব

ক) সব দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না দেওয়া

খ) দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বা আপিল কর্তৃপক্ষের নাম ও অন্যান্য তথ্য প্রদর্শন না করা

গ) সংশিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পেতে সমস্যা

ঘ) তথ্যের অনুরোধ নেওয়ার সময় বিরক্তি প্রকাশ এবং কখনোবা প্রত্যাখ্যান

ঙ) তথ্য দেওয়ার আগে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাওয়া

চ) কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং জনগণের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে প্রচারণার উদ্যোগের অভাব

ছ) কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সক্রিয় তথ্য প্রকাশের অভাব

জ) তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা সুযোগ-সুবিধার অভাব

৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা যেসব ভৌত সুযোগ-সুবিধার ঘাটতির মুখোমুখি হন

ক. দপ্তরে আবেদনের ফরম না থাকা

খ. কোনো কোনো দপ্তরে কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ফটোকপি করার যন্ত্র না থাকা

গ. কোনো কোনো দপ্তরে ইন্টারনেট এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকা, ইত্যাদি

৪. তথ্য অধিকার আইন মেনে চলার জন্য এখন পর্যন্ত যেসব খাতে বাজেট বরাদ্দ নেই

ক. অনুরোধ করা তথ্যের ফটোকপি করার ব্যয়

খ. বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যয়

গ. পরিদর্শন ইত্যাদি করার ব্যবস্থা

৫. অন্যান্য চ্যালেঞ্জ

ক. তথ্য অধিকার আইন আইন ও এর বিধিবিধান সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের ধারণার অভাব

খ. আইনটির বাস্তবায়নের সময় কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা গেছে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে উপস্থিতি থাকতে বাধ্য করার জন্য কিছু রদবদল দরকার

গ. প্রচারমাধ্যমের উদ্যোগের অভাব

ঘ. কর্মকর্তাদের মানসিকতা গোপনীয়তা থেকে উন্মুক্ততার দিকে নিয়ে যাওয়া

১১. সুপারিশ

চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারের জন্য আলাদা করে সুপারিশ করা হয়েছে- তথ্য সরবরাহকারী, সরবরাহের দিক; তথ্যের জন্য আবেদনকারী, চাহিদার দিক; মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কার্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য কমিশন।

ক. সরবরাহ দিকের জন্য

- সব সরকারি দপ্তরে অবশ্যই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উপকরণগত সহায়তা দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে
- সব কর্তৃপক্ষকে প্রোঅ্যাক্টিভ ও রিঅ্যাক্টিভ উভয় ধরনের তথ্য প্রকাশের জন্য তথ্য প্রকাশ নীতি গ্রহণের ওপর জোর দিতে হবে
- ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে

খ. চাহিদার দিকের জন্য

- সাধারণ নাগরিকের কাছে তথ্য অধিকার আইন আইনটি পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে
- সুনির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত ভিত্তিক সচেতনতা কর্মসূচি নিতে হবে
- সব কর্তৃপক্ষ/দপ্তরে তথ্য অধিকার আইন আবেদন ফরম পাওয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে

গ. মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের জন্য

- সব কর্তৃপক্ষের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় উপকরণগত সহায়তা সরবরাহ করা নিশ্চিত করতে হবে
- তথ্য অধিকার আইন আইনের বিধিবিধান মেনে চলার সুবিধার্থে এ জন্য বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা
- নাগরিকরা যাতে সহজে এবং স্বচ্ছন্দে আবেদন করে তথ্য পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরে একটি অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে
- জনগণকে তথ্য অধিকার আইন আইনের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের তথ্য অধিকার আইন আবেদন করার নিয়ম সম্পর্কে শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া
- নাম, পদবি, ই-মেইল ঠিকানা ও যোগাযোগের নম্বরসহ ডিও এবং এএ-দের তালিকা সবসময়ই হালনাগাদ করে প্রকাশ এবং নাগরিকদের সুবিধার্থে প্রদর্শন করতে হবে
- প্রোঅ্যাক্টিভ তথ্য প্রকাশের আওতা/সুযোগ বৃদ্ধি করা
- সিটিজেন চার্টারসহ নাগরিকের দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরি সমস্যা সমাধানের এমন উপায়সম্বলিত তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা এবং প্রোঅ্যাক্টিভ প্রকাশ হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা
- নাগরিকরা যাতে অফিস সময়ে কার্যালয় অথবা ঘটনাস্থলে গিয়ে তথ্য ও দলিলপত্র পরিদর্শন করতে পারে কর্তৃপক্ষকে সে ব্যবস্থা করতে হবে
- তথ্য ও রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণে পদক্ষেপ নেওয়া
- অনলাইনে তথ্যের জন্য আবেদন পেশ ও তা সরবরাহের ব্যবস্থা করা

ঘ. তথ্য কমিশনের জন্য

- তথ্য কমিশনকে ডিও নিয়োগ, প্রোঅ্যাক্টিভ তথ্য প্রকাশের হাল অবস্থা এবং তথ্য অধিকার আইন রিটার্ন দাখিলের বিষয়গুলো ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আইন মানার ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে
- কমিশনকে দ্বিধাহীনভাবে তথ্য অধিকার আইন আইনে তাকে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে
- তথ্য অধিকার আইন আইন নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিতে হবে
- তথ্য অধিকার আইন আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অন্যান্য আইনগুলো যতো দ্রুত সম্ভব সংশোধন করতে হবে, কারণ এ কারণে ডিওরা দায়িত্বপালনে স্বচ্ছন্দ হতে পারেন না
- তথ্য অধিকার আইন আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে গত ৬ বছরের দেখা প্রতিবন্ধকতাগুলোর বিবেচনায় আইনটির ৭ ধারার স্বেচ্ছাধীন/যথেচ্ছা ব্যবহার ও শুনানিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর বাধ্যতামূলক উপস্থিতির ব্যবস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে সরকারের কাছে প্রস্তাব করতে হবে
- অনলাইনে অভিযোগ দাখিল ও ভিডিও কনফারেন্সভিত্তিক শুনানির সুবিধা চালু করা
- তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আরও বেশি ছোট টিভিসি, প্রামাণ্যচিত্র, নাটক, গান তৈরি করা এবং আইনটি জনপ্রিয় করতে সেগুলো দেশব্যাপী প্রচার করা
- এ আইনের আওতায় তথ্য অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় করা।

উপসংহারে এ কথা বলা যায় যে, ২০০৯ সালের জুলাইতে জারি ও কার্যকর হওয়ার পর থেকে তথ্য অধিকার আইনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকার যথাযথভাবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য কমিশন গঠন করেছে এবং প্রধান ও অন্যান্য তথ্য কমিশনার নিয়োগ দিয়েছে। তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ এবং ভালোভাবেই যাত্রা শুরু করার উপযোগী অফিসও দেওয়া হয়েছে। সরকার তথ্য কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য একটু জমিও বরাদ্দ করেছে। সরকারের গৃহীত এ সব পদক্ষেপ কর্তৃপক্ষের ওপর নাগরিকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের ক্ষমতায়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক অঙ্গীকারেরই ইঙ্গিত দেয়। আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালাও তুলনামূলকভাবে কম সময়ের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে। তথ্য প্রদানের বিষয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রস্তুতির বিষয়েও কিছু অগ্রগতি হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য অধিকার আইন আইন বাস্তবায়নের জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরবরাহ দিকে দক্ষতা আরও বাড়াতে হবে। কিন্তু তথ্যপ্রার্থী বা ব্যবহারকারীরা মূলত আইনি বিধিবিধানের ব্যাপারে অসচেতন। জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই আইনের প্রধান লক্ষ্যটি অর্জন করতে হবে। আইনটির প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ বাস্তবায়ন এবং নাগরিকদের ব্যবহার করার ওপর। সবগুলো চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখে তথ্য কমিশন বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ সব সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে জনগণের বিশাল অংশের মধ্যে সচেতনতার অভাব, প্রচারের অভাব, ডিওদের এ বিষয়ে জানাশোনার অভাব, আইনটি ব্যবহারের জন্য উৎসাহ/প্রণোদনার ঘাটতি, জনবলের অভাব এবং তথ্য অধিকার আইন আইনের আইনগত সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

কমিশনের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির ওপর। দেশের নাগরিকদের উচিত আইনটি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনায় এগিয়ে এসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি রাখা। নাগরিকদের কাছে আইনটি পরিচিত করে তুলতে সংবাদমাধ্যম এবং রাজনৈতিক নেতাদের আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখা দরকার। তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সময়কালে জনগণ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন আইনের ব্যবহার একটি ইতিবাচক পথযাত্রার সূচনা করেছে। দেশ গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে কিছুটা হলেও উন্মুক্ততার পথে চলছে। এ বিষয়টি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করবে এবং একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। ■

কীভাবে জনপ্রিয় হতে পারে তথ্য অধিকার আইন

সুরাইয়া বেগম
সহকারী পরিচালক
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস
বাংলাদেশ

যেকোনো সরকারি খাসজমি ও জলাভূমি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভূমিহীন, দরিদ্র, বিধবা, সহায়-সম্পত্তিহীন মানুষের রয়েছে সবার আগে অধিকার। ভূমিহীন মানুষকে এই তথ্য জানানো আমাদের সবার দায়িত্ব।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ গত ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে ছয় বছর পূর্ণ করেছে। উল্লেখ্য, এই আইন বাংলাদেশে এক শক্তিশালী নাগরিকবান্ধব আইন। এ আইনের মাধ্যমে জনগণ সরকারি ও বেসরকারি (আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী) কর্তৃপক্ষের কাজের হিসাব চাইতে পারে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা স্থাপনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আর এসবের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অথচ আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, ছয় বছরে আইনটি যে পরিমাণে নাগরিকের কাছে পৌঁছানের দরকার ছিল তা হয়নি। নাগরিকের পক্ষ থেকে যে পরিমাণ আবেদন জমা পড়েছে তা এর জনপ্রিয়তার প্রমাণ- এ কথা বলা যাচ্ছে না। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে তথ্য কমিশনের বার্ষিক পরিসংখ্যানে। এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অর্থাৎ ২০১৩ পর্যন্ত তথ্য কমিশনের হিসাব অনুযায়ী মোট আবেদন পড়েছে ৬১ হাজার ৪২০ টি। এর মধ্যে প্রথম বছর, অর্থাৎ ২০১০-এ ছিল ২৫ হাজার ৪১০টি। এই সংখ্যাটি সমালোচিত হয়েছে যে, এই আবেদনগুলো যথার্থ অর্থে তথ্য আবেদন ছিল না। পরবর্তী বছরগুলোতে এর সংখ্যা তাই হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ২০১০-২০১৫ (১৫-০৪-২০১৫) পর্যন্ত সময়ের তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল হয়েছে ৯০৬টি, আমলে গৃহীত হয়েছে ৫০৪টি এবং এর মধ্যে নিস্পত্তি করা হয়েছে ৮৯২টি, স্থগিত ১টি এবং প্রক্রিয়াধীন আছে ১৩টি। এই পরিসংখ্যান আমাদের অন্বেষণ করতে অনুপ্রাণিত করে যে, কীভাবে আইনটিকে জনপ্রিয় করা যায়।

১. তথ্য অধিকার আইনের প্রসারে চ্যালেঞ্জগুলো

তথ্য অধিকার আইনটিকে কীভাবে আরো জনপ্রিয় করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার আগে এর প্রসারে চ্যালেঞ্জগুলো কী কী সে বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। কারণ তার পরিপ্রেক্ষিতেই জনপ্রিয় করার পন্থা আলোচনার ক্ষেত্রে উপলব্ধির জায়গাটা স্পষ্ট হবে। তথ্য অধিকার আইনের তিনটি ক্ষেত্রে ডিমান্ড সাইড, সাপ্লাই সাইড এবং তথ্য কমিশনে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এখানে তা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

ক. তথ্য চাহিদাকারী (Demand Side)

অর্থাৎ যারা তথ্যের জন্য আবেদন করে থাকেন, অন্য কথায় জনগণ। এই ডিমান্ড সাইডে যেসব চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান তাতে দেখা যায় যে-

- সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবীর মধ্যে আইনটির ব্যাপারে এখনো অজ্ঞতা রয়ে গেছে। যারা জানেন তাদের আইনটি চর্চায় অনীহা লক্ষ করা যায়।
- ছয় বছর পার হবার পরও আইনটি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। আইনের চর্চার মাধ্যমে যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই বিশ্বাসের ঘাটতি আছে এখনো।
- নাগরিকের আইনটির প্রতি মালিকানাবোধ সৃষ্টি না হওয়া, অর্থাৎ- আইনটিকে নিজের মনে না করা। বাংলাদেশের দাতা গোষ্ঠীর চাপে, কিছু এনজিও এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সুপারিশে আইনটি পাস হয়েছিল ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অর্ডিন্যান্স হিসেবে এবং পরে ২০০৯ সালে এটি পার্লামেন্টে পাস হয়। কিন্তু পার্লামেন্টে পাস হয় কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই। আইনটি জনগণের আন্দোলন বা চাহিদা প্রসূত ছিল, এ কথা বলা যায় না। জনগণের এবং জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ছাড়া পাস হওয়া আইন মালিকানাহীনতার অন্যতম কারণ।
- আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে নারীদের সমমর্যাদার প্রশ্নটি এখনো অসমান। তাই, নারীদের কাছে এই আইনের গুরুত্ব খুবই কম। নারীদের রয়েছে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও চলাচলের স্বাধীনতার অভাব। জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ তাই এই আইনের সুবিধার কথা জানেনা বা বঞ্চিত।
- কোথায় এবং কী প্রক্রিয়ায় আবেদন করতে হবে জনগণ এখনো ঠিকমতো জানে না। জনগণকে জানানোর জন্য সঠিক পরিকল্পনার অভাব রয়েছে।
- তথ্য অধিকার আবেদনপত্র পাঠানোর ফলোআপ খরচ এবং যাতায়াত খরচ বহন করার মত ক্ষমতা না থাকা। তথ্য আবেদনের ক্ষেত্রে ফটোকপি, ডাকখরচ, যাতাযাত ও যোগাযোগের জন্য কিছু পরিমাণে হলেও অর্থের প্রয়োজন। অনেকের সেই সামর্থ্য থাকে না, ফলে তথ্য আবেদনের পরিমাণ কম হয়।
- মনস্তাত্ত্বিক মূল্য। সরকারি কর্মকর্তাদের বিরোধিতা হুমকি ইত্যাদিকে প্রতিরোধ করতে জনগণকে যে ভোগান্তি পোহাতে হয়, সেই মূল্যও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সরকারি অফিসে গিয়ে কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হতে ভয় পায়। সরকারি কর্মকর্তাদের জনগনকে হয়রানি এবং ভীতি দেখানোর বিষয়টি একটি বড় বাধা। এই ভীতি এখনো সামাজে বিদ্যমান।

খ. তথ্য প্রদানকারি (Supply Side)

যারা তথ্য প্রদান করবে অর্থাৎ সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ, তাদের ক্ষেত্রেও এখনো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে যা তথ্য অধিকার আইনের প্রসারে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। যেমন-

- আইনটি প্রয়োগের ব্যাপারে সরকারের যে ধরনের কার্যকরি উদ্যোগ নেওয়া জরুরি ছিল, গত ছয় বছরে কার্য ক্রমে তার অভাব পরিদৃষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে এই ব্যাপারে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই ছয় বছরে অভাপ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তদের ঘন ঘন বদলির কারণে তথ্য আবেদনগুলো সময়মতো নিষ্পতি হতে সমস্যা হয়।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তদের আইনের ওপর যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং ফলোআপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা, অর্থাৎ ক্যাপাসিটি বিল্ডিঙের অভাব।
- আমলাতন্ত্রের বিদ্যমান মাইন্ডসেট, বিশেষ করে গোপনীয়তার সংস্কৃতির চর্চা করা। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তদের আমলতান্ত্রিক মানসিকতা নিয়ে জনগণের মধ্যে যথেষ্ট অভিযোগ আছে।
- সরকারি অফিসে তথ্য রেকর্ড ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঘাটতি। বিশেষ করে অফিসগুলোতে রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট-সহায়ক যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা। যেমন- কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার এবং ওয়েবসাইটে প্রবেশাধিকারের সুযোগ কম থাকা।

- সম্পদ এবং অবকাঠামোর অপ্রতুলতা। অফিসে পর্যাপ্ত স্টাফ না থাকা।
- 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার' পর্যাপ্ত ক্ষমতা না থাকা। সাধারণত সরকারি অফিসে নিম্ন পদের কর্মকর্তাদের 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' করার ফলে তারা তথ্য দিতে ভয় পায় এবং তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। এ ছাড়াও তথ্য সংগ্রহ এবং ডিসক্লোজ করা তাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আইনে তাদের যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে বাস্তবে তা তারা ব্যবহার করতে অপারগ।
- সময়মতো তথ্য দিতে না পারলে তথা অদক্ষতার জন্য জরিমানা দিতে হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কিন্তু দক্ষতার জন্য কোনো পুরস্কার নেই।
- স্বেচ্ছায় তথ্য প্রকাশের যে বাধ্যবাধকতা আইনের উল্লেখ আছে তার প্রকাশ যথাযথ নয়। বিশেষ করে প্রতিটি অফিসের নোটিশবোর্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তার নাম, পদবি ও ঠিকানা টাঙিয়ে দেয়ার কথা, কিন্তু এর যথেষ্ট প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় না।
- তথ্য কমিশন ডিমান্ড ও সাপ্লাই সাইডের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। প্রধানত তথ্য আবেদনকারী অভিযোগের ভিত্তিতে তথ্য কমিশনের এ কাজ করে থাকেন এখানে যেসব চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান তা হচ্ছে-
- তথ্য কমিশনের জনবান্ধব ভূমিকার অভাব। তথ্য কমিশনের শুনানির জন্য সাধারণ নাগরিককে দূর-দূরান্ত থেকে আসতে হয়। কিন্তু আনেক সময় সাপ্লাই সাইডের গর হাজিরার কারণে শুনানি স্থগিত করা হয়। এটি সাধারণ নাগরিককে তথ্য কমিশনে অভিযোগ পাঠাতে অনুৎসাহিত করে থাকে।
- আইনে আপিল কর্মকর্তার ব্যর্থতার ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, ফলে আপিল কর্মকর্তার গাফিলতির কারণে যে ব্যত্যয় ঘটে থাকে তার কোনো জবাবদিহিতা নেই। এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া জরুরি ছিল কিন্তু তা এখনো পর্যাপ্ত নেওয়া হয়নি। বিষয়টি আইনের চর্চাকে স্থবির করতে সহায়ক।
- তথ্য কমিশনের অধিকাংশ কর্মকর্তার সরকারের প্রতি নির্ভরশীলতা। এর কারণ এসব কর্মকর্তা সরকারি অফিস থেকে প্রেষণে এসে স্বাধীন তথ্য কমিশনে কিছুদিনের জন্য কাজ করে থাকেন এবং দায়িত্ব শেষে তারা আবার সরকারি অফিসে ফিরে আসেন এর ফলে তাদের আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া কঠিন হয়ে যায় এবং সরকারি কর্তৃপক্ষগুলোর প্রতি পক্ষপাতিত্বসুলভ মানসিকতা কাজ করার সম্ভাবনাও থেকে যায়, যা আইনের মূল লক্ষ্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মানসিকতা তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।
- আইনের মূল লক্ষ্যের দিকে বিশেষ নজর না দিয়ে এর প্রায়োগিক দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঠিক নাম ও পদবি অনুযায়ী আবেদন না করায় অনেক আবেদন বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে আবেদনকারীরা আবার আবেদন করতে উৎসাহ বোধ করেন না।
- আবেদনপত্র সহজ না করে আরো জটিল করে তোলা। আইনের বিধিমালায় যেভাবে আবেদন করার কথা বলা হয়েছে, পরবর্তী সময়ে তথ্য কমিশন দ্বারা তার মধ্যে 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার' নাম ও পদবি সংযুক্ত করে আবেদনপত্রের ফরমকে জটিলতর করা হয়েছে, বিশেষ করে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য।
- বিভিন্ন সরকারি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ক্রমাগত আইন ভঙ্গ করা সত্ত্বেও তথ্য কমিশনের জরিমানা না করা অর্থ আইনের কার্যকারিতা দুর্বল করা। ছয় বছর পরও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি।

২. বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব ছাড়াও আরো অনেক সমস্যা বিদ্যমান। মোটা দাগে বলা যায় যে, এসব সমস্যা দূর করলেই দেশে তথ্য অধিকার আইন জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সেজন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি এবং দায়বদ্ধতার প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এখানে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় কিছু দিক উপস্থাপনা করা হলো।

চাহিদাকারি সৃষ্টি

- শক্তিশালী ডিমান্ড সাইড তৈরি করার লক্ষ্যে জনগণ এবং নাগরিক সংগঠনের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক সৃষ্টি করা। তথ্য অধিকার ফোরামকে সক্রিয় করা। নিয়মিত ফোরাম সদস্যদের নিয়ে সাধারণ মিটিং করা এবং নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা।
- সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীসহ যুব, নারী, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠন, মিডিয়া, সুশীল সমাজের আইনটির প্রয়োগের কাজে যুক্ত হওয়া।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো দক্ষ কর্মী সৃষ্টি করা।
- গ্রামাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের নানাবিধ অসুবিধা ও অদক্ষতার কথা বিবেচনা করে তথ্য আবেদন, আপিল ও অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া আরো সহজতর করা।
- আইনের ওপর মালিকানা স্থাপনের জন্য আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কেন এটি জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
- ডিমান্ড সাইডকে শক্তিশালী করতে হবে তথ্য অধিকার আইন আইনকে সফল করতে হবে।
- সরকারি গোপনীয়তা আইন বহুকাল যাবৎ চর্চা করার ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের মাইন্ডসেট হয়ে গেছে। সক্রিয় ডিমান্ড সাইড তৈরি করার মাধ্যমে এই বদ্ধতা উন্মুক্ত হতে পারে।
- জনগণ দ্বারা প্রচুর আবেদন ফাইল করা, যাতে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আইনটির খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। ক্রমাগত তথ্যের চাহিদা কর্তৃপক্ষকে সচেতন করবে এবং তারা গুরুত্ব সহকারে আইনের বিভিন্ন দিক বাস্তবায়নে পদক্ষেপ রাখবে।
- সব ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্র আছে। ভারতের বিহার রাজ্যের 'জানকারী কল সেন্টারের' আদলে এসব কেন্দ্র ন্যূনতম ফি'র মাধ্যমে নাগরিকদের পক্ষে তথ্য আবেদন করার ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনাময় ইউনিট হিসেবে কাজ করতে পারে। জানকারী মডেল শুধু আবেদন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করে, তা-ই নয় বরং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনভাবে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করতে সক্ষম করে তোলে।

প্রদানকারী

- ডিমান্ড সাইড শক্তিশালী হলে সাপ্লাই সাইড responsive হবে। সেজন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ জরুরি।
- তথ্য আবেদনের উত্তর প্রদান অর্থ জনগণকে সহায়তা করা এবং এর মাধ্যমে আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারা সম্পর্কে জানা ও শেখা।
- আইন বাস্তবায়নে সরকারের আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন করা। বিশেষ করে, মিডিয়াতে নাটিকা, বিজ্ঞাপন, টক শো এবং তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগণের সফলতার কাহিনি প্রচার করা। যেসব সংগঠন এ বিষয়ে কাজ করছে তাদের সমন্বয়ে একটা ওয়ার্ক প্ল্যান করা ও সে অনুযায়ী কাজ করা।
- ডাটাবেস উন্নয়ন করা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপিল কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা প্রকাশ করা ও তালিকা করা, তথ্য অধিকার আইন আইনের প্রকাশনা, এর বিধিমালা, কার্যক্রম প্রকাশ করা, এবং ট্রেনিং মডিউল তৈরি করা।
- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে হেল্প ডেস্ক চালু করা।
- ইন্টারঅ্যাকটিভ ওয়েবসাইট চালু করা।
- বিভিন্ন প্রশাসনিক নিয়মবিধি এবং এর প্র্যাকটিস যা তথ্য অধিকার আইনকে লঘন করে সে সম্পর্কে গবেষণা করার মাধ্যমে তালিকা করা এবং তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা। কেননা তথ্য অধিকার আইনে বলা আছে যে, অন্য কোনো আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে তথ্য অধিকার আইনই বলবৎ হবে।

তথ্য কমিশন

- তথ্য অধিকার আইনটি মূলত সরকারি কাজে জনগণের নজরদারির মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে। এ ব্যাপারে তথ্য কমিশন তথ্য আবেদনকারীদের প্রতি সংবেদনশীল হলে আইনটি গতিশীল হবে পারবে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের গোপনীয়তার সংস্কৃতিকে দুর্বল করে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। তথ্য কমিশনকে জনবান্ধব হতে হবে।

- ইনফরমেশন কমিশনের সরকারের প্রতি নির্ভরশীলতা কমাতে হবে তাদের স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে। সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য কমিশনে ডেপুটেশনে নিয়োগ তথ্য কমিশনের স্বাধীনতাকে খর্ব করে থাকে।
- নাগরিক সমাজ ও সংগঠনের সঙ্গে তথ্য কমিশনের নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা আইনের প্রসারে সহায়ক হবে এবং জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করবে।
- তথ্য অধিকার আইনকে প্রচার করা এবং জনপ্রিয় করার জন্য মানুষ থেকে মানুষে প্রচার করা হতে পারে সবচেয়ে বড় মাধ্যম। মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে প্রচার করা, বিশেষভাবে রেডিও টিভি প্রোগ্রামে তথ্য অধিকারকে হাইলাইট করে কর্মসূচি নেওয়া। সরকারি এজেন্সিগুলোকে প্রচারের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা। তথ্য মন্ত্রণালয়ের দেশব্যাপী প্রচার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা এবং জেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের তাদের এলাকায় তথ্য অধিকার আইনকে প্রমোট করা দরকার। জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের এনজিওদের অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রামে তথ্য অধিকার আইনকে সম্পৃক্ত করা এবং মৌলিক সেবা প্রাপ্তিতে ডিমান্ড তৈরি করা। এ ছাড়া ডিমান্ড ও সাপ্লাই সাইডের মধ্যে সেতুবন্ধ করা। ধারা-৭ বিষয়ে ধারণাগত অভাব রয়েছে জনগণের মধ্যে। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা আসতে হবে তথ্য কমিশন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের ব্যাখ্যাকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

৩. তথ্য অধিকার আইনের প্রসারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু দিক

তথ্য অধিকার আইনকে প্রসারিত করার জন্য উপরে বিভিন্ন সম্ভাবনা, কাজ ও পন্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেসবের সঙ্গে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার জড়িত, যেগুলো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য। কিন্তু সদিচ্ছা থাকলে ছোট আকারে, সীমিত পরিসরে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিংবা প্রকল্পের কাজের অংশ হিসেবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারিক চর্চার মাধ্যমে এই আইনকে জনগণের মধ্যে প্রসারিত করা যায়। কেননা একজন হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর সে তার কমিউনিটিতে আরো অনেক মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। এর ফলে তথ্য অধিকার আইন এর প্রচার ও প্রসার জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে প্রসার হতে দেখেছি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের শুরু থেকে এই আইনের চর্চায় অভিষিক্ত হয়েছি। বিভিন্ন কমিউনিটিতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, বিশেষ করে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, আদিবাসী, দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে।

সেই অভিজ্ঞতা থেকে যে প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারিক চর্চা বৃদ্ধি পেতে পারে, সে বিষয়ে এখানে সংক্ষিপ্তকারে বর্ণনা করা হলো। এর মাধ্যমে এই আইন ক্রমশ জনপ্রিয়তার ধারায় যুক্ত হতে সক্ষম। বাস্তব অভিজ্ঞতা একে সমর্থন করে থাকে। এই পদ্ধতি সমাজের প্রান্তিক ও মূলধারার জনগোষ্ঠীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

অসম্পূর্ণ তথ্যও বড় সত্যকে বের করে আনতে পারে

দৈনিক প্রথম আলোর সাভার প্রতিনিধি অরূপ রায়, গত ১২ এপ্রিল ২০১৪ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে বিএলআরআই পরিচালিত মহিষ পালন ও ব্যবস্থাপনার ওপর খামারিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। যথাসময়ে তথ্য না পেয়ে ২ জুন বিএলআরআইয়ের মহাপরিচালকের (আপিল কর্তৃপক্ষ) কাছে প্রতিকার চেয়ে আবেদন করা হয়। আপিলের পর গত ১২ জুন তাকে অসম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়।

ওই তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মহিষ পালন ও ব্যবস্থাপনার ওপর খামারিদের প্রশিক্ষণ

১. Participatory Action Research (PAR) তত্ত্বের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীতে গণগবেষণা দল তৈরি করা, যারা তাদের নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে এবং সমস্যার সমাধানে অগ্রসর ভূমিকা পালন করতে পারে। PAR বা গণগবেষণার মৌলিক ধারণা হলো- চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে সমাজে কোনো শ্রেণিই অপর শ্রেণির চেয়ে 'অগ্রসর' নয়। বাস্তবে যা ঘটে দৈনন্দিন সংগ্রামের কারণে কারো চিন্তা করার অবকাশ বেশি, কারো কম। কেউ বা বেঁচে থাকার জন্য স্থানীয় খমতাবান শ্রেণির কাছে চিন্তা সমর্পন করেণ। এতে সাধারণ মানুষের মনে নিজেদের চিন্তাশক্তির ওপর আস্থা হারিয়ে যেতে পারে এবং শিখিত শ্রেণির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। এতে তাদের চিন্তাশক্তি খয়ে যায় না, মরচে ধরে মাত্র। গণগবেষণার একটি প্রধান লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মরচে পড়া চিন্তাশক্তিকে আবার শানিত করা, যাতে তারা গভীর সমাজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের জীবনের অবস্থার উন্নতির যৌথ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। এই প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা আবার যৌথভাবে বিশ্লেষণ করে নিজেদের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান উন্নত করেন এবং সেই উন্নত জ্ঞানের আলোকে আবার নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। গণগবেষণা মানুষের আত্মোন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে এবং সুবিধাবঞ্চিতদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে সাহায্য করে। জনগণকে যৌথ অনুসন্ধানে উজ্জীবিত করে এবং বাইরের সহায়তার ওপর নির্ভর না করে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবার শক্তি দেয়। জনগণের আত্মমর্যাদাকে জাগিয়ে তোলে এবং তাদের চিন্তা ও কর্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বের করে আনে। গণগবেষণা জনগণকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে ভাবতে শেখায়, চিন্তার জগতটাকে বিস্তৃত করে। তাদের সৃজনশীলতাকে বিকশিত করে। এই প্রক্রিয়া জনগণকে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পথ প্রদর্শন করে। গণগবেষণা বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে সহায়ক।

কর্মসূচিতে কর্মকর্তারা একই সময়ে একাধিক স্থানে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। আর এভাবে একাধিক স্থান থেকেই তারা দিনপ্রতি এক হাজার টাকা করে ভাতা গ্রহণ করেছেন।

২০১১-২০১২ অর্থবছরে জামালপুর, রংপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, বাগেরহাট, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ, পটুয়াখালী, ফেনী এবং লক্ষ্মীপুর জেলার ২২টি উপজেলায় এক হাজার ৩২০ জন খামারিকে মহিষ পালন ও ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে বিভিন্ন খাতে খরচ দেখানো হয়েছে ৪০ লাখ ৯৬ হাজার টাকা। মাত্র তিনজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ২২টি উপজেলায় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে সব ভাতা গ্রহণ করেছেন।

২০১১ সালে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় ১৬ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর, বদরগঞ্জ উপজেলায় ১৭ থেকে ২১ নভেম্বর, জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর, সদর উপজেলায় ১১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলায় ২১ থেকে ২৫ ডিসেম্বর, ভূঞাপুর উপজেলায় ২০ থেকে ২৪ ডিসেম্বর এবং ২০১২ সালে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ফুলবাড়ী উপজেলায় ১৪ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি, হালুয়াঘাট উপজেলায় ১৫ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি, লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলায় ৬ থেকে ১০ মে এবং সদর উপজেলায় ৫ থেকে ৯ মে পর্যন্ত চলা প্রশিক্ষণগুলোতে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন বিএলআরআইয়ের একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এসও)। নিয়মানুযায়ী ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর থেকে ২০১২ সালের ১০ মে পর্যন্ত চলা প্রশিক্ষণে তার মূলত ৩১ দিন দায়িত্ব পালন করার কথা। কিন্তু কাগজে-কলমে একই সময়ে একাধিক উপজেলায় কর্মরত দেখানোর কারণে তিনি ৩১ দিনের স্থলে ৫৫ দিনে ৫৫ হাজার টাকা ভাতা গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন ২৬ জুন ২০১৪ তারিখের দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত হয়েছে।

এসব ঘটনা প্রমাণ করে একটি ছোট্ট আবেদন, কিছু অসম্পূর্ণ তথ্যও কতো বড় সত্যো বের করে আনতে পারে। এটাই তথ্য অধিকার আইনের শক্তি; এখানেই তার মাহাত্ম্য। ■

তথ্য পেলে গরিব লোক, খুলে যাবে তাদের চোখ

২. একজন অ্যানিমেটরের উজ্জীবনার মাধ্যমে গণগবেষণা দল যৌথভাবে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে।

৩. গণগবেষণার মাধ্যমে যেসব সমস্যা চিহ্নিত করা হয় তার পেছনের কারণ হিসেবে তথ্য না জানাকে চিহ্নিত করা। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। তথ্য না জানার কারণে যেসব সমস্যা হয়ে থাকে সেসব সমস্যাকে চিহ্নিত করে তথ্য অধিকার আইনে আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা।

৪. সমস্যা সমাধানে তথ্য অধিকার আইনের সম্পৃক্ততা তুলে ধরা এবং কীভাবে সমাধানের ক্ষেত্রে এই আইন হাতিয়ার হতে পারে তা দৃষ্টান্ত সহকারে বর্ণনা করা।

৫. একজন দক্ষ প্রশিক্ষক প্রয়োজন। যিনি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানেন, আইন বাস্তবায়নে আগ্রহী এবং অধিকার সচেতন ব্যক্তি। যিনি সক্ষম হবেন বিশ্লেষণ করতে যে, সমস্যার সঙ্গে তথ্যের অপর্যাপ্ততার সম্পর্ক কী এবং তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে কীভাবে সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখা যায়।

৬. তথ্য অধিকার আইনকে জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহজ ভাষায় বর্ণনা করা। বিশ্লেষণ করে, আইন প্রয়োগের জন্য প্রাথমিক যে ধারাগুলো জানা এবং প্র্যাকটিস করা অত্যাবশ্যক, সেসব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা একই সঙ্গে প্রশিক্ষণকালে সবাইকে যেকোনো একটি ইস্যু সম্পর্কে আবেদনপত্র লেখানো এবং তা সবার সঙ্গে একত্রে আলোচনা করা যে কোন কোন জায়গায় ভুল হচ্ছে। পরে তা সংশোধন করা। এভাবে ভুল সংশোধন করা হচ্ছে শিক্ষণপ্রক্রিয়া। ফলে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সঠিকভাবে আবেদনপত্র লিখতে সক্ষম হবেন।

৭. আবেদনপত্র পাঠানোর তারিখ, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কোন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে তার নাম ও ঠিকানা, আইন অনুযায়ী কত তারিখের মধ্যে তথ্য পাওয়ার কথা, তথ্য কবে পাওয়া হয়েছে, তথ্য না পেলে আপিলের জন্য নির্ধারিত তারিখ, অভিযোগের তারিখ ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য এক নজরে দেখার জন্য তালিকা প্রণয়ন এবং লিপিবদ্ধকরণ এবং তার ফলোআপ করা জরুরি।

৮. কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। সবাই মিলে এ ক্ষেত্রে আলোচনা করতে পারে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আচরণ কেমন হবে প্রসঙ্গে জানানো যে, তথ্য আবেদন প্রদানের সময় খারাপ ব্যবহার বা ঝগড়া করা উচিত নয়। তথ্য আবেদনপত্র গ্রহণ না করলে বা তথ্য না দিলে তার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা আছে এবং সেই ব্যবস্থা অনুসরণ করা দরকার। ধৈর্য ধরা দরকার। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমেই আইনানুগ ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করা সম্ভব। এতে ব্যক্তিগত শত্রুতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

৯. তথ্য অধিকার আইন আইনকে জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। বিশেষ করে সাধারণ জনগণের সরকারি সেবাসুবিধা লাভের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।

১০. কমিউনিটিতে তথ্য অধিকার আইনের প্রসারের ক্ষেত্রে অ্যানিমেটরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একজন সৃজনশীল অ্যানিমেটর আইনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে কার্যকর প্রভাব রাখে।

১১. মানবাধিকার ইস্যুতে আগে থেকেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রয়েছে যেসব কমিউনিটিতে, সেখানে তথ্য অধিকার আইনের প্রসার দ্রুত ঘটে থাকে।

১২. অন্য দিকে ছাত্রসমাজের মধ্যে এই আইনের প্রসার লাভ সহজেই হতে পারে, যদি উদ্যোগ নেওয়া যায়। কারণ আইনের প্রসারে শিক্ষার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১৩. প্রাথমিকভাবে তথ্য আবেদনের ক্ষেত্রে সহজ ইস্যু এবং তথ্য পাওয়া যাবে, এমন বিষয় নিয়ে আবেদন করা। এর ফলে যা অর্জিত হবে:

- সরকারি অফিসে তথ্য আবেদন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় এ বিষয়ে আবেদনকারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।
- আবেদনকারী দ্রুত পরবর্তী বিষয়ে আবেদনে আগ্রহী হবে। কারণ সফলতা মানুষকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে।
- আবেদনের মাত্রা ও ভিন্নতা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি তারা শুধু নিজেদের নয় কমিউনিটির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়েও তথ্য আবেদনে আগ্রহী হয়ে উঠবে। সাধারণ তথ্য থেকে ক্রমশ সচ্ছতা এবং জবাবদিহিমূলক তথ্য খোঁজার জন্য উৎসাহী হবে।

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাদের মতে, এই আইনের মূল উদ্দেশ্য নাগরিকের ক্ষমতায়ন। তথ্য অধিকার আইন তা সম্পন্ন করেছে এবং জনগণকে ক্ষমতা দিয়েছে সরকারি কর্মকাণ্ড চ্যালেঞ্জ করার। যদিও আইনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণিত আছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে গণতন্ত্র শক্তিশালী করার কথা কিন্তু প্রকারান্তরে তা নাগরিকের ক্ষমতায়নের জন্যই। প্রান্তিক দুর্গম এলাকায় যাদের কথা বলার সুযোগ নেই, তারা এই আইনের মাধ্যমে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। আবার যে সমাজে জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আন্দোলনরত, তাদের আন্দোলনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনকে যদি একীভূত করা যায়, তাহলে তা একটা শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। সরকারি কাজকর্মকে যথার্থ রাস্তায় থাকার জন্য চাপে রাখতে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রচারণা অব্যাহত রাখা দরকার, যাতে তাদের বেঁচে থাকার মূল প্রশ্নগুলো আড়ালে হারিয়ে না যায়।

অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের জন্য জরুরি হচ্ছে, প্রতিষ্ঠান এবং কিছু নীতি- যা তৈরি করার জন্য দরকার তথ্য অধিকার চর্চা। তথ্য অধিকার আইন মূলত ক্ষমতার সমান অংশীদারিত্বের একটি দাবি একই সঙ্গে যেকোনো কর্তৃপক্ষের লাগামহীন ক্ষমতাচর্চার রাশ টেনে ধরে। এই আইনকে জনপ্রিয় করার জন্য তাই যা-কিছু করা দরকার তা করতে হবে এবং তা করতে হবে আমাদের সবাইকে। ■

তথ্য: রুদ্ধ ও মুক্ত

মঞ্জুর হাসান, ওবিই
নির্বাহী পরিচালক
সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব
অ্যাডভান্সড লিগ্যাল অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস স্টাডিজ

"প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা এবং প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে।

বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ করা এবং যে কোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে

তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা এবং জানবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।"

অনুচ্ছেদ: ১৯, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির ফলে পুরো বিশ্বের প্রায় সকল তথ্যের জানালা আজ খুলে গেছে। জ্ঞানের সব দরজা প্রায় উন্মুক্ত হয়েছে। সাগরের তলদেশ, সুউচ্চ হিমালয়ের শৃঙ্গ, কিংবা সুনীল আকাশের মহাশূন্য থেকে মানুষ আজ তথ্য আদান-প্রদানে সক্ষম! পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষের ভাব ও বক্তব্য, মত ও মতবাদ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তথ্য ও উপাত্ত অন্য প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া বা বিনিময়ের ফলেই আজ পৃথিবীর মানুষ সভ্যতার এই স্তরে এসে পৌঁছেছে।

প্রাচীনকালে তথ্য ছিল প্রায় অবরুদ্ধ, আজ উন্মুক্ত হওয়ার দিন এসেছে। মানুষ তাদের ভাব, বক্তব্য, মত, অমত, বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে পাঠাতে পারে খুব সহজেই, এক নিমিষে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায়, প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং প্রকাশ করার, বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে কোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ এবং জানবার স্বাধীনতার অধিকারের স্বীকৃতি ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে "... প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার, অধিকারের, এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা ..." দেওয়া হয়েছে (অনুচ্ছেদ: ৩৯)। বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের দূরত্ব ঘুচানোর চেষ্টার ধারাবাহিকতায় জনগণের দাবির মুখে ২০০৯ সালে দেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে– যা রাষ্ট্রের প্রায় সকল তথ্য জনগণের পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের অধিকারের দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

সারা বিশ্বে খুব পরিচিত কথা, 'তথ্যই শক্তি'। কিন্তু কীভাবে? বাংলাদেশ একটি প্রজাতন্ত্র, এবং এই রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায়, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ.." কথাটি রয়েছে। এ বিষয়ে অবহিত নাগরিকের আচরণ অন্যদের থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। তথ্য নাগরিককে শক্তি দেয়। তথ্য শক্তি হয়ে নাগরিককে ক্ষমতায়িত করে। যেমন: বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার সম্পর্কে অবহিত নাগরিক রাষ্ট্রে তার নিজ মর্যাদা এবং অধিকার সম্পর্কে সম্যক সচেতন। ফলে তিনি নাগরিক হিসেবে তার যথাযথ ভূমিকা নির্ধারণে স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে

থাকবেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের কোনো শাখা বা সংস্থা, অন্য কোনো শাখা বা প্রতিষ্ঠানের কাছে কী বিষয়ে, কী দাবি জানাবে, বা সেবা প্রত্যাশা করবে তা একজন নাগরিক জানবেন। এছাড়াও অবহিত নাগরিক মত প্রকাশ, সংগঠিত হওয়া কিংবা রাজনৈতিক দল গড়ার ক্ষেত্রে আত্মপ্রত্যয়ী হবেন।

তথ্য অধিকার আইনে 'তথ্য অধিকার' কথাটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।' তথ্য অধিকার আইন সংসদে বিল আকারে উত্থাপনের সময় আইনটির উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়, 'জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক।'

সরকার নিজেই জনগণকে ক্ষমতায়িত করার জন্য এই আইন করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আইন প্রণয়ন করার মাধ্যমেই কি সর্বোচ্চ সংখ্যক জনগণকে তথ্য দিয়ে অবহিত এবং ক্ষমতায়িত করা সম্ভব? না, অবশ্যই তা নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই মুখ্য। রাষ্ট্র জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত-পরিচালিত হওয়ার কথা। সুতরাং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকরা সম্যকভাবে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যথাযথ অবহিত নন, সে রাষ্ট্র উন্নত গণতন্ত্রে পৌঁছুতে ব্যর্থ হবে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্তই হচ্ছে শিক্ষিত, সচেতন, সক্রিয় জনগণ।

আর তাই সংবিধান ও তথ্য অধিকার আইনের আলোকে এখন রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণের কাছে যতো দ্রুত সম্ভব সহজ উপায়ে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্রের আইন, প্রতিষ্ঠান, কাঠামো, সেবা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উন্মুক্তভাবে তুলে ধরা, তথ্য রুদ্ধ করা নয়। কারণ তথ্যের দ্বার রুদ্ধ করে শিক্ষিত, সচেতন, সক্রিয় নাগরিক তৈরি করা অসম্ভব।

আরও বেশি গণতন্ত্রের পাশাপাশি আজ সারা বিশ্বে সচেতন জনগোষ্ঠীর দাবি– রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সুশাসনের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে- জনগণের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। বলার অপেক্ষা রাখে না, তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে নাগরিককে সব না জানালে জনঅংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সরকারের স্তরসমূহের গঠন ও কার্যক্রমের কথা। যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং জাতীয় সংসদ। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন। সরকারের স্তর ও গঠন এবং নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত ভোটারই তার যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনে সফল হতে পারেন। আরও বলা যায়, উপজেলা পর্যায়ে সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠান যেমন: থানা-পুলিশ, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কৃষি, পশুসম্পদ, মৎস্য, শিক্ষা, ভূমি, সমবায়, নির্বাচন, প্রকৌশল, নারী বিষয়ক এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দপ্তর রয়েছে। কিন্তু একজন নিরক্ষর কিংবা অসচেতন বা তথ্য জানেনা এমন নাগরিকের পক্ষে কি এইসব দপ্তর থেকে তার প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করা কী সম্ভব? যে কোনোভাবেই বলি না কেন নাগরিক না জানলে বা তথ্য ঠিকমত না পেলে সরকার আংশিকভাবে ব্যর্থ বলা যেতে পারে।

সুতরাং দপ্তরের সামনে 'সিটিজেন চার্টার' টানিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রকেই উপায় খুঁজে বের করতে হবে কীভাবে তার "মালিক" অর্থাৎ দেশের জনগণকে সচেতন করবে, এর ওপরই নির্ভর করবে নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের মান।

তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকায় বলা হয়েছে। "যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে ...।" সুতরাং রাষ্ট্রকেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ নিতে হবে– তার আইনের বিধান পালনে, জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে। এ জন্য রাষ্ট্র কমিশন বসিয়েছেন। কিন্তু জনগণের সচেতনতা, সক্রিয়তা ও তথ্য পাওয়ার অধিকার বাস্তবায়নের মন্থর গতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ও কমিশনের কার্যক্রম পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। ■

স্বচ্ছ সরকার ও তথ্য অধিকার

শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

যখন একটি সরকারকে স্বচ্ছ বলা যায় তখন ধরে নিতে হবে যে সে রাষ্ট্রের নাগরিকরা তাদের সরকারের সব কাজ, গৃহীত নীতিমালা, পদ্ধতি ও বিধিবিধান সম্পর্কে সহজে তথ্য পায় বা পাচ্ছে। তবে কেবল পদ্ধতি নয়, পদ্ধতিগুলো কীভাবে কাজ করে আর তার ব্যাখ্যাই বা কীভাবে করা হয় সেগুলোও এখানে বিবেচ্য। বস্তুত স্বচ্ছ সরকার হচ্ছে তথ্যের অধিকার ও নাগরিকের সামাজিক/রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে (পাবলিক লাইফ) অংশগ্রহণের অধিকারের সমন্বয়।

বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরে আসার পর স্বচ্ছ সরকারের বিষয়ে জনগণের প্রত্যাশা বেড়ে যায়। নয় বছরের স্বৈরশাসনের পর অবাধ ও মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার পেয়েছিল বাংলাদেশ। সবার প্রত্যাশা ছিল এবার সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদের বাস্তবায়ন হবে যাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'জনগণই রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক'। তবে সরকারের বদল হলেও ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেলো। আগের মতোই গোপনীয়তার সংস্কৃতি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিটি কার্যক্রমে প্রাধান্য বিস্তার করে চললো। কোরাম সংকট ও প্রধান বিরোধীদলের নিয়মিত বর্জনের মতো বিভিন্ন কারণে আমাদের সংসদও স্বচ্ছ সরকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

তবে এ সময়কালের অন্যতম ইতিবাচক ঘটনা হচ্ছে, একটি সক্রিয় ও শক্তিশালী সুশীল সমাজের বিকাশ যা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ শাসন এবং জনগণের অংশগ্রহণের দাবি জানাতে শুরু করে। দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ এবং নির্বাচিত পরিষদগুলোর আরও বেশি জবাবদিহিতার দাবি ক্রমশ জোরালো হতে থাকে।

পাশাপাশি জোরদার হয় সুশীল সমাজের নজরদারির ভূমিকাটিও।

এক পর্যায়ে স্বচ্ছ শাসনের দাবির ধারাবাহিকতায় তথ্য অধিকারের বিষয়ে আইন প্রণয়নের দাবি ওঠে। এমন প্রেক্ষাপটেই ২০০৫ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস করে প্রতিবেশী দেশ ভারত। এতে বাংলাদেশের সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো এখানেও একই ধরনের একটি আইনের দাবি তোলার জন্য আরও বেশি সমর্থন পায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঐ সময়কালে বিশ্বের ৬৫টি দেশে তথ্য অধিকার আইন ছিল। আইনটি যে সত্যিই সর্বত্র সরকারি কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততা নিয়ে আসছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ তখনই পাওয়া যায়। এটা উল্লেখ করা দরকার যে, বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের দাবি

তথ্য যদি থাকে গোপন, ঠকবে গরিব বাড়বে শোষন

তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোগ বা আন্দোলন থেকে আসেনি। সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টাই মূলত একে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা পেতে স্থানীয় পর্যায়ের মানুষ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় দীর্ঘদিনের উন্নয়ন কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এ সংগঠনগুলো সেইসব বিষয়ে জেনেছিল। তথ্য অধিকার আইনকে তখন দেখা হয়েছিল মূলত মৌলিক সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা বিতরণের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্তদের চাপে রাখার কৌশল হিসেবে।

তথ্য অধিকার আইন হয়েছে আজ প্রায় ছয় বছর হলো। আইনটির বাস্তবায়ন পরিস্থিতি এবং যে প্রত্যাশা নিয়ে তা প্রণয়ন করা হয়েছিল, তার কতোটা বাস্তবায়িত হয়েছে সে বিষয়ে অনেক কথাই বলা যেতে পারে। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত, এটি আমলাতন্ত্রকে একটা বড় নাড়া দিয়েছে এবং স্বচ্ছ শাসনের ব্যাপারটিকে মনোযোগের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

- ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি স্ট্র্যাটেজি (এনআইএস) কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রণালয়গুলোর বার্ষিক মূল্যায়ন পরিচালনা করা। এতে তথ্য অধিকার আইন আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়গুলোকে নম্বর দেওয়া হয়।
- একটি তথ্য অধিকার আইন ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। আট সদস্যের এ কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। অন্য সদস্যরা হচ্ছেন তিনজন সচিব, তথ্য কমিশন ও এটুআই-এর প্রতিনিধি, বিএফইউজের সভাপতি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব।
- তথ্য অধিকার আইন ওয়ার্কিং গ্রুপের পরামর্শের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য অধিকার আইন আইন বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় ১৬ সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করার নির্দেশনা দিয়েছে। এনআইএস-কে জোরদার ও তথ্য অধিকার আইন আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একজন সচিবের নেতৃত্বে সমন্বয় ও সংস্কার নামে একটি বিশেষ বিভাগ গঠন করা হয়েছে।
- পিসিএআই প্রজেক্টের (এমআরডিআই) আওতায় তথ্য প্রকাশ নীতিমালা (আইডিপি) বিষয়ক নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। এটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সব মন্ত্রণালয়কে ওই নির্দেশিকার আলোকে তাদের নিজস্ব

আইডিপি/আইডিজি তৈরি করার নির্দেশনা দিয়েছে।

এগুলো সবই খুব ইতিবাচক উদ্যোগ। তবে প্রশাসনে স্বচ্ছতা প্রকৃত অর্থে বাস্তবায়ন করতে চাইলে উন্মুক্ততার **(ওপেননেস)** জন্য আরও সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে। বেসামরিক প্রশাসন, সংসদ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক কর্মসংস্কৃতির মধ্যে একটি পরিবর্তনের প্রয়োজন (স্বচ্ছ প্রশাসনের অধিকার বিষয়ক নাওমি পেপার)। এটা প্রয়োজন বেসামরিক প্রশাসন, সংসদ ও রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মপদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য।

তথ্য অধিকার আইন এমন একটি হাতিয়ার যা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা হলে সত্যিকার অর্থেই দুর্নীতি হ্রাস করবে ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা বয়ে আনবে। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, প্রকৃতই একটি জনগণের আইন, অন্য কোনো আইন এমন নয়। এ আইনটি নাগরিককে তার নাগরিকত্বের অধিকার দেয়। কারণ, এটি শ্রেণিগত মর্যাদা নির্বিশেষে সব স্তরের নাগরিককে নির্দিষ্ট কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া রাষ্ট্রের সব বিষয়ে তথ্য চাওয়ার অধিকার দেয়। এটি জনগণকে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বা সম্পদের অপব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তোলা ও সরকারি কাজে অংশগ্রহণের অধিকার এবং কীভাবে রাজস্ব বাজেটের অর্থ ব্যয় হবে সে বিষয়ে মতামত দেওয়ার সুযোগ দেয়। এর ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সেবা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি হলে তা জনগণের নজরে আসার পথ প্রশস্ত হয়।

বিশ্বের অনেক দেশে দুর্নীতি রোধ করতে, বিশেষ করে বিভিন্ন সেবা ও প্রাপ্য ভাতার মতো সুযোগ-সুবিধা সঠিকভাবে বিতরণ নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হচ্ছে ভারত। সেখানে তথ্য অধিকার আইন আইন প্রয়োগ করে দরিদ্রদের জন্য নির্ধারিত হাজার হাজার টাকা বরাদ্দ তছরুপ হওয়া থেকে রক্ষা করা গেছে। বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিষয়ে তথ্য দাবি করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কার্যকরভাবে তথ্য অধিকার আইনকে কাজে লাগাতে পারায় সেবা সরবরাহের মান উন্নত ও অপচয়-দুর্নীতি রোধ হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা সেটি হলো দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা এখন এ ব্যাপারে সচেতন হয়েছেন যে, নাগরিকদের তাদের চাওয়া প্রয়োজনীয় তথ্য না দেওয়া আইনের পরিপন্থী।

বাংলাদেশেও তথ্য অধিকার আইনের অধীনে করা বেশির ভাগ আবেদনই হয়ে থাকে ভাতা এবং বিভিন্ন সেবা সুযোগ-সুবিধা নিয়ে। ভিজিডি কর্মসূচিতে বরাদ্দ হওয়া গমের পরিমাণ বা বয়স্ক ভাতার অর্থের অঙ্ক জানতে তথ্য চেয়ে স্থানীয় মানুষের আবেদন করার অনেক উদাহরণ রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন আইন ব্যবহার করার মাধ্যমে অনেক সময় কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা হয়েছে উপকারভোগীদের সঠিক পরিমাণ/অঙ্কের সেবা বা ভাতা দেওয়ার জন্য। লক্ষ্যমাত্রার উন্নতির পাশাপাশি (টার্গেটিং হ্যাজ ইমপ্রুভড অ্যান্ড লিকেজ প্রিভেন্টেড) অনিয়ম/দুর্নীতি ঠেকানো গেছে। এ থেকে তথ্য অধিকার আইন এবং সর্বস্তরে দুর্নীতি হ্রাসের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক থাকার বিষয়টিই ফুটে ওঠে।

তারপরও বলতে হয়, বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পরিস্থিতি এখনো যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। এ আইনের আওতায় আবেদনের সংখ্যা প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম রয়ে গেছে। এর সম্ভাব্য কারণগুলোর মধ্যে আছে সচেতনতার অভাব, নিস্পৃহতা ও অনাগ্রহ অথবা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ানোর আশঙ্কা। আমাদের ভয়ের বাধা পেরোতে হবে। বদলাতে হবে এই গোপনীয়তার সংস্কৃতি। এর ফলে জনগণ প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য আবেদন করার মতো ক্ষমতায়িত বোধ করতে পারবে।

এটা মনে রাখা জরুরি যে, শুধু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা পাওয়ার জন্য তথ্য অধিকার আইন করা হয়নি। এর পেছনে যে চেতনাটি কাজ করেছে তা হলো রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনায় জনগণের পূর্ণ ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। তথ্য অধিকার আইন আইন পরিপূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করা সম্ভব হলে রাষ্ট্রের সব বিভাগের কার্যক্রমে আরও বেশি স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততা আসবে। ফলে দুর্নীতি ও সরকারি সম্পদের অপব্যবহার কমবে। এগুলো একটি স্বচ্ছ সরকারের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। বাংলাদেশকে সব নাগরিকের সমতা ও কল্যাণে বিশ্বাসী একটি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে উঠে আসতে হলে এ বিষয়গুলো অতি জরুরি। ■

তথ্য অধিকার
ইতিহাস থেকে নেয়া

হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
তথ্য অধিকারকর্মী

ভারত উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে হিসাব করলে এটি প্রায় ১০০ বছরের পুরোনো। হিসাবটি এমন– নেটিভরা মানে এখানকার আদি বাসিন্দারা যাতে সরকারি তথ্য জানতে চাইতে না পারে, সেজন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯২৩ সালে 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট' জারি করে। সেই থেকে শুরু হলো তথ্য গোপনের চর্চা। এর মানে কি আমাদের ধরে নিতে হবে যে, ১৯২৩ সালের আগে ব্রিটিশ শাসকের সব তথ্য জনগণের জন্য খোলা ছিল। তাহলে কি তারও আগে রাজা-বাদশা, নবাব, সুলতান সম্রাটদের সব খবর বা তথ্য প্রজারা অবাধে পেতো? তাদের খাজাঞ্চি খানায় কী পরিমাণ ধন-সম্পদ জমা ছিল তার খবর কি প্রজাদের কাছে ছিল? প্রজা পীড়ন করে আদায় করা খাজনার টাকার কতোটা কী কাজে ব্যবহার হতো এসব হিসাব কি প্রজাদের জানা ছিল?

ব্যাপারটা মোটেও সেরকম ছিল না। সাধারণ মানুষের অধিকার বঞ্চনার ইতিহাস যতোটা পুরোনো, সমাজের শ্রেণি বিভাজনের ইতিহাস যতোটা পুরোনো, তথ্য বঞ্চনার ইতিহাসও ততোটাই পুরোনো- সভ্যতার ক্রম বিকাশের যে পর্যায়ে এসে সমাজে শ্রেণি বিভাজন হয়েছে, সে পর্যায়ে এসে ক্ষমতাবানরা সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে রেখেছে। এভাবে তারা নিজেদের নিরাপদ রেখেছে, তাদের বৈভব ও স্বাচ্ছন্দ্যকে নিরাপদ রেখেছে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের যে পর্যায়ে এসে গণতন্ত্র বিকশিত হয়েছে, তখন থেকে জনগণের জানার অধিকার বিষয়টি বিবেচনায় এসেছে। গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে তথ্য অধিকারের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। যে দেশে গণতন্ত্র যতো বেশি শক্তিশালী, সেখানে জনগণের জানার অধিকার ততো বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত। আবার অন্যভাবেও বলা যায়- যে দেশে জনগণের জানার অধিকার যতো বেশি প্রতিষ্ঠিত সেই দেশে গণতন্ত্র ততো বেশি সুসংহত হয়েছে।

তথ্য অধিকারের প্রথম স্বীকৃতি সুইডেনে

আমরা জানি যে, গণতন্ত্র বিকাশের উর্বর ক্ষেত্র হলো ইউরোপ। সুতরাং তথ্য অধিকারের আদি ইতিহাসের জন্মও ইউরোপে। 'তথ্য অধিকার' বিশ্বে প্রথম আইনি স্বীকৃতি পায় সুইডেনে। ১৭৬৬ একজন ফিনিশীয় যাজক 'এন্ড্রু সিডেনাস' সুইডেনের সংসদ রিকসডাগ (Riksdag) এ বিলটি উত্থাপন করেন। ডিসেম্বরের ২ তারিখে সুইডেনের সংসদ "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইন, ১৭৬৬" পাস করে। সরকারের তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে এটাই বিশ্বের প্রথম আইন।

নামে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইন হলেও এই আইনটির মাধ্যমে সুইডিশ জনগণকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট অথবা প্রাপ্ত দলিল দস্তাবেজ পাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। সরকার, সংসদ এবং চার্চ ও স্থানীয় সরকারের আইনসভা সবকিছুই এই আইনের আওতাধীন ছিল। এই আইনের আইনের নীতি নির্দেশ করে তথ্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ, সর্বনিম্ন

রক্ষা/প্রতিরোধ, দ্রুত এবং বিনা খরচে প্রবেশাধিকার, তথ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হলে এর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করার ও পুনরায় তথ্যে প্রবেশের অধিকার। এই বিষয়গুলো আধুনিক তথ্য অধিকারেরও মৌলিক ভিত্তি।

এরপর হয় কলম্বিয়ায়

সুইডেনে আইন পাসের ১২২ বছর পর, ১৮৮৮ সালে দ্বিতীয় দেশ কলম্বিয়া যারা তথ্য অধিকার আইন পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে কলম্বিয়ার জনগণকে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও আর্কাইভে সংরক্ষিত তথ্যে প্রবেশাধিকারের বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়।

ফরাসি বিপ্লব ও তথ্য অধিকার

ইউরোপ এবং পশ্চিমা সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ফরাসি বিপ্লব। এই বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে গণতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ফরাসি বিপ্লবকে পশ্চিমা গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যার মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতা নিরঙ্কুশ রাজনীতি এবং অভিজাততন্ত্র থেকে নাগরিকত্বের যুগে পদার্পণ করে।

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী ঘোষণায় (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 26 August, 1789) তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই ঘোষণাপত্রের ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদে নাগরিকের জানার অধিকারের কথা বলা হয়। অনুচ্ছেদ ১৪ তে বলা হয়-

“সরকারি করের প্রয়োজনীয়তা, করমুক্ত রাখার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান, আদায়কৃত করের ব্যবহার এবং এটির অংশ, উৎস বা ভিত্তি, সংগ্রহ এবং ব্যাপ্তিকাল ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে সকল নাগরিকের নিজের, কিংবা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে জানার অধিকার রয়েছে।”

(All citizens have the right to ascertain, by themselves, or through their representatives, the need for a public tax, to consent to it freely, to watch over its use, and to determine its proportion, basis, collection and duration.)

ঘোষণাপত্রের ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়-

“একজন সরকারি কর্মকর্তার কাছে তার প্রশাসন সংক্রান্ত হিসাব চাওয়ার অধিকার জনগণের রয়েছে।”

(Society has the right to ask a public official for an accounting of his administration)

নারীর অধিকারের দাবি: ভিন্ন উপস্থাপন

কিন্তু ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী ঘোষণা, নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসন পরিচালনায় নারী অধিকারের বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষিত হয়। সে সেসময় নারী অধিকারকর্মীদের দাবি ও উদ্যোগের প্রতি অনাগ্রহ দেখায় বিপ্লবের পুরুষ নেতারা। এই অবস্থায় ১৭৯১ সালে নারী অধিকারকর্মী ‘অলিম্পে পি গুজেস’ (Olympe de gouges) নারী অধিকার বিষয়ে একটি সমান্তরাল ঘোষণা প্রকাশ করেন। এই ঘোষণাটিকে বলা হয়- Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen, 1791, যা ছিল বিপ্লবী ঘোষণাপত্রের অনুরূপ। এতে প্রতিটি অনুচ্ছেদে পুরুষের পাসাপাশি নারী শব্দটি যুক্ত করা হয়।

এই ঘোষণাপত্রেও ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদে নাগরিকের জানার অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অনুচ্ছেদ ১৪-এর মূল বিষয় ছিল-

“সরকারি অনুদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাষ্ট্রের নারী-পুরুষ যেকোনো নাগরিকের কিংবা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করার অধিকার রয়েছে”

(Female and male citizens have the right to verify, either by themselves or through their representatives, the necessity of the public contribution. This can only apply to women in they are granted an equal share, not only of wealth, but also of public administration, and in the determination of the proportion, the base, the collection, and the duration of the tax.)

অনুচ্ছেদ ১৪ এর মূল বিষয় ছিল-

কর সংক্রান্ত ব্যাপারে নারীদের দল, পুরুষ দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে যেকোন সরকারি সংস্থার প্রশাসনিক হিসাব চাওয়ার অধিকার রয়েছে।”

(The collectivity of women, joined for tax purposes to the aggregate of men, has the right to demand an accounting of his administration from any public agent.)

১৯৮৯ সাল: এলো তথ্যের স্বাধীনতা আইন

১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ঘটনাকে আমরা তথ্য অধিকার আইনের দ্বিতীয় পর্যায় বলতে পারি। এই সময়ে আমেরিকা, ইউরোপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১২টি দেশে তথ্যের স্বাধীনতা আইন (FOI laws) প্রণীত হয়। এই দেশগুলোর সবগুলোই ছিল উন্নত বিশ্বের দেশ। কিন্তু এই সময়ে প্রণীত আইনগুলো শক্তিশালী আইন ছিল না। এই সময়ের আইনগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল-

- নির্বাহী বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে, জনপ্রতিনিধির অফিস এবং বিচার বিভাগকে প্রায়ই বাদ দেওয়া হয়।
- শুধু অফিসিয়াল ডকুমেন্টস-এ প্রবেশের সুযোগ রয়েছে (তথ্য নয়)
- ডকুমেন্টস দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়ে কোনো দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট নেই
- অনুভূতিপ্রবণ তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সর্বময় ক্ষমতা থাকা
- আইন লংঘনের জন্য কোনো শাস্তির বিধান না থাকা
- বাস্তবায়ন-মনিটরিং কিংবা প্রতিবিধানমূলক কোনো ব্যবস্থা/দায়িত্ব আইনে না থাকা
- এই দেশগুলোর মধ্যে কানাডা সর্বপ্রথম স্বাধীন তথ্য কমিশন গঠন করে

তথ্য অধিকার: জাতিসংঘের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে

বিংশ শতাব্দীতে তথ্য নাগরিকের অধিকারের স্বীকৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি (The International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) এ তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়:

'Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes their freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.'

(প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে; হস্তক্ষেপ ব্যতীত মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা-নির্বিশেষে যে-কোনো মাধ্যমে তথ্য ও মতামত অন্বেষণ, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।)

১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালে UN General Assembly Resolution 2200A (XXI) হিসেবে ICCPR গৃহীত হয়। গত মে ২০১৩ পর্যন্ত এটি বিশ্বের ১৬৭টি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আইনগত একটি সন্ধিপত্র (Treaty), যাতে UDHR-এর ১৯ নম্বর ধারার প্রায় অনুরূপ তথ্য অধিকার ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া কমনওয়েলথ তথ্যের স্বাধীনতার নীতিমালা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার কনভেনশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে তথ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

নয়-এর দশকে তথ্য অধিকার আইন

নয়-এর দশকে মোট ২০টি দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়। এই ১৯টি দেশের মধ্যে ৯টি উন্নয়নশীল দেশ। এই তালিকায় কয়েকটি উন্নত দেশও আছে। এই সময়ের একটি বড় ঘটনা হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়া। সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পর পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ তথ্য অধিকার আইন পাস করে।

এটি তথ্য অধিকারের তৃতীয় পর্যায়। এই সময়ে প্রণীত বেশির ভাগ আইনেই আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ– রাষ্ট্রের এই ৩টি অঙ্গকে

সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সর্বোচ্চ প্রকাশের নীতি, সর্বনিম্ন সুরক্ষা, জনস্বার্থকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া, স্বাধীন আপিল পদ্ধতি এই সময়ের আইনগুলোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। এই সময়েই তথ্য সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য স্বাধীন তথ্য কমিশনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

বিংশ শতাব্দীতে: তথ্য অধিকারের জয়জয়কার

বিংশ শতাব্দীতে এসে নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জয়জয়কার শুরু হয়। বিগত ১৪ বছরে ৭০টির মতো দেশ তথ্য অধিকার আইন পাস করেছে। তথ্য অধিকার আইনের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এ সময়ের আইনগুলো অনেক জনবান্ধব ও আধুনিক। এই সময়ের আইনে রাষ্ট্রের এই ৩টি অঙ্গকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অনেক দেশ বেসরকারি সংস্থাসমূহকেও (এনজিও) সম্পৃক্ত করেছে।

এই সময়ে প্রণীত আইনে সর্বোচ্চ প্রকাশ, সর্বনিম্ন সুরক্ষা, জনস্বার্থকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া, প্রত্যাখ্যাত হলে আপিলের ব্যবস্থা, বিরোধ মীমাংসার জন্য স্বাধীন তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, আইনের প্রাধান্য, আইন লংঘনে শাস্তির ব্যবস্থা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সংযুক্ত আছে।

সব মিলিয়ে বিশ্বে এখন ১০২টির মতো দেশে তথ্য অধিকার আইন বা তথ্যের স্বাধীনতা আইন আছে। হালে প্রণীত আইনগুলো পূর্বের আইনগুলোর চেয়ে আরো শক্তিশালী হচ্ছে, এতে আরো আধুনিক চিন্তার সন্নিবেশ ঘটছে। গোপনীয়তা চর্চার কাল পেরিয়ে সারা পৃথিবীতে এখন অবাধ তথ্য প্রবাহের কাল শুরু হয়েছে। তথ্য প্রবাহ এখন সভ্যতার মাপকাঠি হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

প্রায় আড়াই'শ বছর আগে সুইডেনে যাজক সিডেনাস যে আলো জ্বেলেছিলেন, সেই আলোই এখন সারা পৃথিবীর অধিকারবঞ্চিত মানুষকে অধিকার আদায়ের পথ দেখাচ্ছে। আমরাও স্বপ্ন দেখি, এই আলো সকল অন্ধকার সরিয়ে, সকল অনিয়ম-অনাচার দূর করে, সকল শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবে সমতার সমাজ। ■

ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট

১৯৮৩ সাল, দেশে তখন সামরিক শাসন। নানারকম নিষেধাজ্ঞার কারণে রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর চলছে কড়া নিয়ন্ত্রণ। সভা-সমাবেশ-মিছিল বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। পত্র-পত্রিকাগুলোও চাপ ও হুমকির ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। স্বাধীনভাবে সংবাদ প্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। যদিও সব সামরিক আমলের মতোই সেই সময়েও সরকার থেকে জেহাদ ঘোষণা করা হয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে, আওয়াজ তোলা হয় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার।

এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতি কমাতে নাগরিকদের ক্ষমতায়নের কথা বলে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে একটি সুপারিশমালা চূড়ান্ত করতে সরকার গঠন করে "বাংলাদেশ প্রেস কমিশন"। ১৯৮৪ সালে কমিশন রিপোর্ট দেয় যাতে "ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্ট" নামে একটি আইন করার জন্য সরকারের কাছে লিখিত মতামত তুলে ধরা হয়। এই প্রেস কমিশনের রিপোর্টেই বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তথ্য অধিকার তথা স্বাধীনভাবে তথ্য পাওয়া ও তা প্রকাশ করার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।

লক্ষণীয়, সামরিক সরকারের গঠন করা একটি কমিশন হলেও তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি তারা এড়িয়ে যেতে পারেনি। যদিও রিপোর্ট দেওয়ার মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ ছিল এবং সে রিপোর্টের আলোকে কোনো কাজও হয়নি। *(১৯৮৩ সালে তৎকালীন এরশাদ সরকারের আমলে বাংলাদেশ প্রেস কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৮৪ সালে তারা সরকারের কাছে রিপোর্ট দেয়। প্রবীণ আইনজীবী ও রাজনীতিক আতাউর রহমান খান ছিলেন এর চেয়ারম্যান। সদস্য ছিলেন দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট পত্রিকা সম্পাদক।)*

–শাহানা হুদা

তথ্য অধিকার অভিযাত্রা

ব্যারিস্টার তানজীবউল আলম
অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট

তথ্য অধিকারের (তথ্য অধিকার আইন) আন্দোলনে আমার যোগ দেওয়া হয়েছে ঘটনাচক্রেই। বাংলাদেশে তথ্য অধিকারের আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের গঠিত অ্যাডভোকেসি গ্রুপের সদস্য হিসেবে আমাকে যুক্ত করা না হলে এই আন্দোলনে হয়তো আমার থাকা হতো না। এ অবদান রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান শামসুল বারি। বারী ভাই সম্ভাব্য সদস্য হিসেবে আমার নাম শাহীন আপার কাছে প্রস্তাব করেন।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন থেকে ফোন করে জানানো হলো, আমি তথ্য অধিকার অ্যাডভোকেসি গ্রুপের সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। আর এর নেতৃত্বে আছেন সুলতানা কামাল। মানবাধিকার আন্দোলনে আমি সক্রিয় আছি সেই ১৯৯৭ সাল থেকে, যখন এই পেশায় যোগ দিয়েছিলাম। অ্যাডভোকেসি গ্রুপের ভূমিকা এবং সেই গ্রুপের একজন সদস্য হিসেবে প্রত্যাশিত ভূমিকা আমার কাছে অজানা কিছু ছিল না। তবে গ্রুপের প্রথম বৈঠকে যোগ দিয়ে দেখলাম, এটা আর দশটা অ্যাডভোকেসি গ্রুপের মতো নয়। এরা সত্যিকার অর্থে কাজ করতে চান। আমাদের তথ্য অধিকার আইন অ্যাডভোকেসি গ্রুপ গঠিত হয় সুলতানা কামালকে আহ্বায়ক এবং শামসুল বারি, শাহীন আনাম, শাহদীন মালিক, আসিফ নজরুল ও আমাকে সদস্য করে। এই গ্রুপে আরও কিছু নাম থাকতে পারে, আমি এই মুহূর্তে তা মনে করতে পারছি না।

প্রথাগত অ্যাডভোকেসি গ্রুপের সঙ্গে ব্যতিক্রম হিসেবে আমাদের গ্রুপ তথ্য অধিকার আইনের খসড়া করার লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রথম বৈঠকে আমরা আমাদের কর্মপরিকল্পনা ও কীভাবে সে লক্ষ্য অর্জন করা যায়, তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি। বারী ভাই বৈঠকে তথ্য অধিকার আইন বিলের খসড়ার একাংশ উপস্থাপন করেন। আমি সেটার কঠোর সমালোচনা করলাম। আমি বোধ হয় মানবাধিকার ও সুশীল সমাজের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত গ্রুপের সদস্য হওয়ার উত্তেজনায় একটু বেশিই কথা বলছিলাম। এখনো মনে পরে, শাহীন আনাম প্রকল্পের কাজটিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে কীভাবে সবাইকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমরা সবাই বুঝতে পারছিলাম, সময়ের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রুপের দ্বিতীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, ভালোভাবে কাজ এগোনোর সুবিধার্থে একটি ছোট গ্রুপ গঠন করতে হবে মডেল তথ্য অধিকার বিলের খসড়া প্রণয়নের জন্য। আমাদের ভাবনাটা ছিল, সরকারের কাছে তথ্য অধিকার আইনের দাবি তোলার চেয়ে বরং একটি খসড়া আইন তৈরি করে দিয়ে তা বাস্তবায়নের দাবি করা ভালো। পেছন ফিরে তাকালে এখন মনে হয়, সেটা ছিল খুবই বাস্তবসম্মত একটি বুদ্ধি। আমি আনন্দিত যে এমন একটি প্রক্রিয়ার অংশ হতে পেরেছিলাম।

আইনের খসড়া তৈরির কাজটি মূলত কারিগরি বিষয় বলে আইন বিষয়ের অভিজ্ঞতা থাকা সদস্যদের এ দায়িত্ব দেওয়া হলো। বারী ভাই ব্যারিস্টার বলে আইনের দিক থেকে তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড অত্যন্ত জোরালো। তবে কাজটির ধরন বিবেচনায় তাকে মূলত পুরো বিষয়টি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হলো। আর প্রকৃত খসড়া তৈরির দায়িত্ব পড়লো আমিসহ তিনজনের ওপর। অন্য দু'জন শাহদীন ভাই ও আসিফ নজরুল ভাই। 'টেকনিক্যাল সদস্যদের' মধ্যে আমি সবচেয়ে কমবয়সী ছিলাম বলে প্রথম খসড়া তৈরির দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। ঠিক হলো আমার খসড়ার ওপর অন্য দুই সদস্য কাজ করবেন। আমরা বেশ কয়েকবার শাহদীন ভাইয়ের ধানমন্ডির বাসায় বসেছিলাম। অনেক কাপ চা-কফি, লোডশেডিং আর জুলাই-সেপ্টেম্বরের (২০০৫) প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আমরা তথ্য অধিকার বিলের প্রথম খসড়া তৈরি করে ফেললাম। পরে অবশ্য আসিফ নজরুল ভাই ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে তুলনামূলক তথ্য অধিকার আইন আইন বিষয়ে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের সুযোগ পেয়ে চলে গেলেন।

আইনটির খসড়া তৈরির কাজে প্রারম্ভিক উপাদান হিসেবে আমরা তথ্য অধিকার নিয়ে ২০০২ সালে প্রকাশিত আইন কমিশনের প্রতিবেদন ব্যবহার করেছি। আইন মকমিশনের ওই প্রতিবেদন তৈরির সময় এই উপমহাদেশে তথ্য অধিকার আইনয়ের ধারণা বিকাশমান পর্যায়ে ছিল। আমরা তথ্য অধিকার আইন নিয়ে ভারতে নাগরিক সমাজের আন্দোলন দেখেছিলাম। আমরা লক্ষ করেছিলাম, এটা কীভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও সুশাসন নিশ্চিত করতে কার্যকর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সবাই উৎসাহিত হয়েছিলাম। ভারতের তথ্য অধিকার আইন কমিশনের চেয়ারপারসনের সঙ্গে বৈঠকের কথা আমার এখনো মনে পড়ে।

আইনটির খসড়া প্রণয়নের সময় আমরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম যে, যা চাইবো তার সবটাই পাবো না। তবে আমাদের চেষ্টায় কোনো ঘাটতি ছিল না। সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালো তথ্য অধিকার আইনের চেষ্টা করেছি আমরা। যে কোনো আন্তর্জাতিক মানের তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য হলো, সর্বোচ্চ তথ্য প্রকাশ এবং সর্বনিম্ন ব্যতিক্রম। অসংখ্য পরস্পরবিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে এ বিষয়ে একটি ভারসাম্য অর্জন করা সহজ নয়। এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ স্বচ্ছ সরকারের জন্য অপরিহার্য শর্ত। একইসঙ্গে জনসাধারণের কাছে রাষ্ট্রের গোপনীয় তথ্য প্রকাশ কখনো কখনো দেশের নিরাপত্তার অপরিমেয় ক্ষতি করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কও।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অবাধ তথ্যের প্রবাহ বহাল রাখা আরেকটি চ্যালেঞ্জ। পরস্পরবিরোধী স্বার্থগুলোর মধ্যে ভারসাম্যের ব্যবস্থা না থাকলে যে কোনো আইনেরই অপব্যবহারের আশঙ্কা থাকে। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, এটি করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আইনটি প্রণয়নে অংশগ্রহণমূলক কৌশল নেওয়া। বিভাগীয় সদর দপ্তর ও ঢাকায় সাংবাদিক মহল, সুশীল সমাজ ও আমলাদের মতো বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে অনেকগুলো সেমিনার আয়োজনের মতো বিশাল কাজটি করে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। এখানে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সেমিনারগুলো আয়োজনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ফারজানা নাঈম, সানজিদা সোবহান, শাহানা হুদার কাছে আমি কৃতজ্ঞ সময়সূচি বদলের মতো আমার অনেক অযৌক্তিক অনুরোধ রক্ষা করার জন্য।

প্রস্তাবিত তথ্য অধিকার আইনের সাফল্য পুরোটাই নির্ভর করে সরকারি কর্মকর্তাদের আস্থা অর্জনের ওপর। সেহেতু তাদের এ বিষয়ে সচেতন করে তুলে শতাব্দীপ্রাচীন উপনিবেশিক গোপনীয়তার খোলস থেকে বের করে আনাটা ছিল খুব জরুরি। তথ্য

অধিকার আইনকে ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেট/সিক্রেসি আইনের মতো একটা বড় বাধা অতিক্রম করে আসতে হয়েছে।

আমি আনন্দিত যে, আমাদের খসড়া তথ্য অধিকার বিলটি বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের কাছে ইতিবাচকভাবে গৃহীত হয়েছে। সুশীল সমাজের কাছ থেকেও ভালো সাড়া পেয়েছে এটি। সাধারণ মানুষ অবশ্য কোনো ধরনের ব্যতিক্রমহীন একটি আইন চেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা এবং আমলাতন্ত্রের মনোভাবের কথা বিবেচনায় নিয়ে স্টেকহোল্ডাররা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এটা মেনে নেন যে, কোনো ধরনের ব্যতিক্রমের তালিকাবিহীন একটি আইন কার্যত অসম্ভব। এর পর আমাদের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের তালিকাটিকে কতো ছোট করা যায় সেটা। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সরকারকে শেষ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন বিলের যে খসড়াটি জমা দেয় তাতে ব্যতিক্রমের তালিকায় মাত্র ১১ ধরনের তথ্য ছিল। তবে সরকার ও আমলাতন্ত্র তাদের অপরিসীম 'প্রজ্ঞাবশত' ব্যতিক্রমের শ্রেণিটি বাড়িয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, অনেক স্টেকহোল্ডারই মনে করেন তা আইনটির বাস্তবায়ন কঠিন করে তুলেছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মাত্রা সম্পর্কে বলতে হলে বলবো, দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বিচারে আমি সুন্দর একটি আগামীর ব্যাপারে আশাবাদী। তথ্য অধিকারের বাস্তবায়ন অনেকটাই এর সম্ভাব্য উপকারভোগীদের আন্তরিকতার ওপর নির্ভর করে। সেহেতু যে পর্যন্ত না আমরা তথ্য চাইতে শুরু করবো এবং এ বিষয়ে লেগে থাকবো, সে পর্যন্ত এ দেশের আমলাতন্ত্র হার মানবে না। তথ্য অধিকার আইন আইনের বর্তমান অবস্থা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার এই পংক্তি দু'টির কথাই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়: আমরা যদি না জাগি মা/কেমনে সকাল হবে। ■

নারীর ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন

রুখতে নারী নির্যাতন, চাই না আর তথ্য গোপন

এই লেখাটি একটি বৃহত্তর আইনি, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়নে লিঙ্গ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং তথ্য অধিকারের (তথ্য অধিকার আইন) ব্যবহারের বিষয়টি তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা। এখানে বিশেষ করে সেই নারীগোষ্ঠীকে তুলে ধরা হয়েছে যারা জাতিগতভাবে বৈষম্যের শিকার প্রান্তিক খামারের মালিক বা কর্মরত নিম্নবর্ণের মানুষ বা প্রান্তিক আদিবাসী। এই লেখার মাধ্যমে সেইসব নারীদের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। নারীদের মূলধারার উন্নয়নে নিয়ে আসার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও তারা অনেক পেছনে পড়ে আছে। পরিবার ও সমাজসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য রয়ে গেছে।

দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৮ দশমিক পাঁচ শতাংশ নারী। এর ৭০ শতাংশই ক্ষুদ্র চাষি এবং অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে। এদের মধ্যে অনেকেই ভূমিহীন কৃষক এবং বিক্ষিপ্তভাবে শ্রম বিক্রি, ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্যান্য অনিয়মিত উৎস থেকে জীবিকা অর্জন করে। প্রায় ১০ শতাংশ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি নারী। মাত্র ১৫ থেকে ২০ শতাংশ নারী পেশাদার ব্যবসায়ী বা বড় আকারে ভূমির মালিক; যাদের বাইরে গিয়ে চাকরি করার প্রয়োজন নেই (হালিম, ২০০৬এ.)। তবে এটা

স্পষ্ট যে, নারীরা বাংলাদেশে সমজাতীয় কোনো গোষ্ঠী নয়। তাদের সামাজিক অবস্থান শ্রেণিভেদে বিভিন্নরকম হয়।

এটা উলেখযোগ্য যে, সাধারণভাবেই নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বাদ পড়ে গেছে সামাজিক স্তরের নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাদ পড়া এবং বঞ্চনার শিকার হওয়ার মাত্রা বেড়ে যায়। তবে নারীকে যদি জমির মালিকানা দেয়া হয় তাহলে সে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব পেতে পারে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বৈষম্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শক্তিশালী হতে পারে। সেটা ঘরে এবং বাইরে-দুই জায়গাতেই হতে পারে। জমির মালিক হলে একজন নারীর দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়ে যা পরিবারের মধ্যে অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে আরও বেশি লৈঙ্গিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের' ধারণাটি এখনো বেশির ভাগ গ্রামীণ নারীর কাছে অচেনা বিষয় (হালিম ২০০৬এ.)। এ ছাড়া বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তিগত ও উন্নয়নমূলক বিষয়গুলো নারীদের ভূমির অধিকারী হওয়ার সুযোগ এবং ভূমি ও সম্পদের ওপর তার নিয়ন্ত্রণের ওপর প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বায়ন এসেছে বাণিজ্যিক বনায়ন, গাছ কাটা, বাঁধ নির্মাণ, পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং জ্বালানি প্রকল্প বা এ ধরনের বিভিন্ন প্রকল্পের রূপে (হালিম ২০০৬ বি.)।

দারিদ্র্য রেখায় বা দারিদ্ররেখার নিচে বসবাসকারী নারীদের মধ্যে রয়েছে প্রান্তিক পরিবারগুলোর নারীর। নারীপ্রধান সংসারও আছে এসব পরিবারের মধ্যে। আছে ভূমিহীন, নিম্ন আয় ও পেশার মানুষ, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত, গ্রামীণ পরিস্থিতির কারণে অভিবাসী, বস্তি, হাওড়-বাওড়-চরবাসী, নিম্নবর্ণ, আদিবাসী গোষ্ঠী, শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের শিকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এবং ভূমি মামলায় দরিদ্র হওয়া মানুষ।

মুসলিম আইনে কন্যা, মা এবং স্ত্রী যে কোনো পরিস্থিতিতে উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পত্তির ভাগ পান। তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এই আইনে নারীদের পুরুষের (অর্থাৎ পুত্র, ভাই ও বাবার) সঙ্গে সমান হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি এবং সে বিচারে এই আইন বৈষম্যমূলক। সম্পত্তির ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মে পুরুষের তুলনায় নারী পান অর্ধেক (সারওয়ার এটএল ২০০৭; উদ্ধৃত হালিম ২০১৩)।

সাংবিধানিক বঞ্চনা ছাড়াও সংখ্যালঘু নারীরা অনুকূল ব্যক্তিগত আইনের সুযোগ পাচ্ছেন না। ব্যক্তিগত আইন অসংশোধিত থেকে যাওয়ার কারণে হিন্দু নারীরাও সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ওই আইন নারীদের সমঅধিকারের স্বীকৃতি দেয় না, যদিও সাংবিধানিকভাবে নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সমান অধিকারের অঙ্গীকার করা হয়েছে। হিন্দু আইন, সংস্কৃতি ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হিন্দু নারীদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের স্বীকৃতি দেয় না। বাংলাদেশে বিদ্যমান হিন্দু আইন এখনো পরিবর্তন করা হয়নি। হিন্দু ধর্মে এই আইনকে ধর্মের (নৈতিক রীতিনীতি) একটি অংশ বলে বিবেচনা করা হয়। হিন্দু নারীরা তাদের প্রথাগত আইন থেকে কোনো অধিকার পান না বলে বৈষম্যের শিকার হন (হালিম, ২০১১)।

উল্লিখিত বিষয়গুলো সত্ত্বেও বাংলাদেশের দরিদ্র গ্রামীণ নারীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দিন দিন বেশি করে দৃশ্যমান হচ্ছেন। তৈরি পোশাক এবং চিংড়ি খাতের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ দুই ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। নারীরা নানা ধরনের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত থেকে জীবিকা অর্জনের সব ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন। বাংলাদেশের বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানের ওপর বিশ্বায়ন সাংঘর্ষিক প্রভাব ফেলছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও ক্ষমতাহীন হওয়া এ উভয় ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব রয়েছে। বিশ্বায়ন ক্ষুদ্র ঋণ এবং নানা কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সুযোগ করে দিয়েছে। কৃষিকাজ এবং অন্যান্য অকৃষি কাজের মাধ্যমে নারীর অর্থ উপার্জনের সুযোগ বাড়ছে। এর ফলে নারীর জন্য বেতনভুক কাজ এবং কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। (হালিম এবং কবির, ২০০৫)।

কাগজে-কলমে জনগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও নারীরা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং জীবনের অন্যান্য সুবিধা থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। নারীদের এই বঞ্চনা এতো বেশি যে তাদের খুব সহজেই 'উন্নয়ন বঞ্চিত' এবং সামাজিকভাবে 'বাদ পড়া' বলে উল্লেখ করা যায়। আরেকটি ইস্যু

হলো ‘সবার জন্য সমান সুযোগের’ বিষয়টি। বাংলাদেশে নারীদের জন্য সুযোগের সমতার ব্যবস্থাগুলো কোথায়? আরেকটি মৌলিক ইস্যু হলো, নাগরিক নারী বা পুরুষ যা-ই হোক না, রাষ্ট্র কারো প্রতি কোনো বৈষম্য করবে না-এ অঙ্গীকারের বিষয়টি। সংবিধানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ {অনুচ্ছেদ ৭ (১)}। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনের মৌলিক চাহিদার ব্যবস্থা করবে {অনুচ্ছেদ ১৫ (ক)}। সংবিধান আরও বলেছে, রাষ্ট্র সব নাগরিকের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করবে। {অনুচ্ছেদ ১৯ (১)}; রাষ্ট্র মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে এবং রাষ্ট্রের সর্বত্র একই স্তরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে {অনুচ্ছেদ ১৯ (২)}। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ওপর ভিত্তি করে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করবে না {অনুচ্ছেদ ২৮ (১)}। কোনো নাগরিকের ওপর ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো গণ বিনোদনকেন্দ্র বা রিসোর্টে প্রবেশ করতে অথবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিধি-নিষেধ বা শর্ত আরোপ করা যাবে না {অনুচ্ছেদ ২৮ (৩)}।

তথ্য অধিকারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে লিঙ্গ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্র শনাক্ত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া নারীর মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বাধা ও চ্যালেঞ্জগুলো খতিয়ে দেখতে হবে।

তথ্য অধিকারের গুরুত্ব কী:

আমাদের এই প্রেক্ষাপটেই তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। এই আইনের মূল সুযোগ হলো এটা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, সুশাসনকে এগিয়ে নেওয়া এবং দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে খুব কার্যকর অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। এই আইন জনগণের ক্ষমতায়নের কথা বলে এবং রাষ্ট্র ও তার বিভিন্ন অঙ্গ, রাজনৈতিক দলগুলো[১] এবং এর নেতৃত্ব, প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নাগরিকদের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হতে তাগিদ দেয়। আইনে (সেকশন ৪) বলা হয়েছে, ‘কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে এবং নাগরিকের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করতে ওই কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে।’ এভাবে এই আইন ক্ষমতার অবস্থানে থাকাদের জন্য তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে কিছু ক্ষমতা অন্যদের দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ‘তথ্য’ বলতে কোনো কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌত গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোনো তথ্যবহ বস্তু বা তার প্রতিলিপিকে বোঝাবে {সেকশন ২ (এফ)}। তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট শিট বা নোট শিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আইসি (তথ্য কমিশন) দেওয়ানি কার্যবিধি (১৯০৮ সাল) অনুযায়ী অভিযোগের নিষ্পত্তি করে। বেশির ভাগ আবেদনকারী আসেন বয়স্ক ভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, কমিউনিটি হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে বিতরণের ওষুধ, কৃষি কার্ড পাওয়ার নিয়ম-নীতি বা খাস জমির বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কাছে তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়ে। এ ছাড়া আবেদন আসে সমবায় কর্মকর্তার অনিয়মের বিরুদ্ধে, চিকিৎসকদের প্র্যাকটিসসংশ্লিষ্ট আইন জানতে, ন্যূনতম মজুরি নিয়ে, ব্যাংক সংশ্লিষ্ট নানা ইস্যুতে এবং এ ধরনের আরও অনেক বিষয়ে। এ ছাড়া

১ ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন সম্প্রতি নিয়ম করেছে যে, দেশটির ছয়টি প্রধান রাজনৈতিক দলকে তাদের তথ্য প্রকাশ করতে হবে। এই দলগুলো সরকারের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে অর্থ পাবে যা দিয়ে পাবলিক ডিউটি পালন করবে। সাংবিধানিকভাবে ও আইনিভাবে দলগুলো বিভিন্ন অধিকার পাবে, আবার তাদের দায়ও থাকবে। (দেখুন ডেইলি স্টার, ৫ জুন, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৪) গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে এবং স্বচ্ছতার স্বার্থে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকেও একইভাবে তথ্য অধিকার আইন আইনে জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত।

আদিবাসীরা আইসির কাছ থেকে ন্যায়বিচার চাইতে আসে। একজন আদিবাসী অধিকারকর্মী বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা কোটার বিষয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আগে আবেদন না শুনলেও বা প্রত্যাখান করলেও আইসি তাদের মাধ্যমে আবেদনকারীকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য সরবরাহ করে অভিযোগের নিস্পত্তি করেছে।

এই আইন বাংলাদেশে জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতিবিরোধী এবং স্বচ্ছতার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের একটি আইনি পদক্ষেপ। মনে করা হয়, অধিকারের চর্চার মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের বদৌলতে নাগরিকরা তাদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষা এবং পাশাপাশি আইনের চোখে সমতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারবে। আইসি কোনো সাংবিধানিক সংস্থা নয়। এটি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সংস্থা। আইনের অনুমোদন সাপেক্ষে আইসি নিজের নামে মামলা করতে পারবে ও এর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে। {পরিচ্ছেদ ৫ (২১)}। আইসি এই আইন কার্যকরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী গঠিত যে কোনো সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে (সংবিধানের ৫৫ (৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রুলস অব বিজনেসের আওতায় গঠিত) একেকটি তথ্য সরবরাহকারী ইউনিট হিসেবে দেখা হয়। {বিস্তারিত তথ্য অধিকার আইন আইনের পরিচ্ছেদ ১ (২বি)}।

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে চারটি পক্ষ জড়িত: তথ্য চেয়ে আবেদনকারী, তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য কমিশন। তথ্য অধিকার আইন আইনকে জোরদার করতে এ বিধান রাখা হয়েছে যে, কোনো কর্তৃপক্ষই তথ্য গোপন করতে পারবে না অথবা তথ্যের অভিগম্যতা সীমিত করতে পারবে না {ব্যতিক্রম হলো আটটি নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা (সেকশন ৩২) যেমনটি রয়েছে ভারতসহ অন্যান্য কিছু দেশে।}

তবে তথ্য অধিকার আইনয়ের ৩২ (২) সেকশনে বলা আছে, যদি ওই আটটি নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোনো তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে ৩২ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে না। তথ্য অধিকার আইন আইন ২০০৯-এর ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে ব্যতিক্রমের তালিকা রয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, ২০টি ক্ষেত্রে সরকার তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য নয়।[২] এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ জনগণকে সরকারি বিষয়ে অংশগ্রহণের এবং কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করার সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। এই আইন স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততাকে এগিয়ে নিচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ নানা ইস্যুতে সাধারণ মানুষ ও নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংলাপ বা আলোচনার সুযোগ তৈরি করতে ভূমিকা রাখছে। এই আইন সর্বস্তরের জনগণকে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে তথ্য চাওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য পেতে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে এই আইনের আওতায় সাধারণ মানুষ ২০১০ সাল থেকে তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ করতে শুরু করেছে।

২ বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এমন তথ্য; পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যা দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হতে পারে; কোনো বিদেশি সরকারের কাছ থেকে পাওয়া কোনো গোপনীয় তথ্য; কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য; আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য; মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোনো আগাম তথ্য; ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য; কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এমন তথ্য; কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কাজ ব্যাহত হতে পারে এমন তথ্য; কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন তথ্য; কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এমন তথ্য; আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য; যে কোনো আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয়; তদন্তাধীন কোনো বিষয়; কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেপ্তার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন তথ্য; আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন তথ্য; কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এমন তথ্য; কোনো ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য; পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য; মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে এমন আনুষঙ্গিক দলিলাদি বা সার-সংক্ষেপবিষয়ক আগাম তথ্য।

তথ্য অধিকার আইনে এ পর্যন্ত (২০১০ থেকে ২০১৫) ৫০ জন নারী তথ্য চেয়ে না পেয়ে তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছেন। এ সময়ে সেখানে মোট অভিযোগ পড়েছে এক হাজার ৩৬টি। শতকরা হারে দাঁড়ায় মাত্র চার দশমিক ৬৩ শতাংশ নারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেছেন। যে সমাজ সংস্কৃতিগতভাবে পিতৃতান্ত্রিক, পুরুষ প্রাধান্যের এবং রক্ষণশীল, সেখানে আরটিআই আইন সত্যিই নারীর ক্ষমতায়ন ঘটাতে পারে যদি তারা এই আইনের কার্যকর ব্যবহার করতে পারে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনয়ের চর্চার মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন আইনের অনুচ্ছেদ ৯ (২) অনুযায়ী আবেদনকারীকে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করবেন। যদি ওই কর্মকর্তা তথ্য না দেন কিংবা আপিল কর্তৃপক্ষের কাছেও আবেদনকারী প্রত্যাখ্যাত হন তাহলে তথ্য না পাওয়ার বিষয়ে ২৪ নং সেকশন অনুযায়ী তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ করা যাবে। তথ্য অধিকার আইন আইন অনুযায়ী {সেকশন ২৫ (১০)} আবেদনকারীর অভিযোগ ন্যূনতম ৪৫ দিন ও সর্বোচ্চ ৭৫ দিনের মধ্যে মীমাংসা করবে তথ্য কমিশন। তথ্য অধিকার আইনয়ের এই বিধান ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ এক পদক্ষেপ।

ভূমি ও অন্যান্য ইস্যুতে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার

গ্রাম ও শহরের বেশির ভাগ মানুষের অভিযোগ ভূমি সংক্রান্ত। তথ্য অধিকার আইন আইন কাজে লাগিয়ে নারীদের সুবিধার জন্য মূলধারার ভূমি নীতিমালা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ভূমিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আলাদা কোনো নীতিমালা নেই। পিছিয়ে থাকা নারীদের জন্য সরকারি ভূমি বরাদ্দ হিসেবেও তা নেই। বাধ্যতামূলক উত্তরাধিকার বিধি কার্যকরেও সামান্যই আইনি হস্তক্ষেপ দেখা যায়। ধর্ম এবং জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে বিয়ের পর এদেশের নারীরা বাবার বাড়ি ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে বাস করতে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় বাবা-মায়ের জমি নিবন্ধনের সময় ভাইয়েরা বোনদের প্রাপ্য অংশ গোপন করে। ভাইদের বিরুদ্ধে মামলা করা বোনদের জন্য কঠিন এবং তাদের প্রশাসনিকসহ বিভিন্ন দাপ্তরিক ঝামেলা পোহাতে হয়। ভাইয়েরা অনেক সময় বোনদের না জানিয়ে তাদের (বোনের) জমির অংশ হস্তান্তর করে এবং এভাবে বোনেরা নিজের অজান্তেই উত্তরাধিকার সূত্রের স্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। এ ক্ষেত্রে নারীরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জমির মালিকানা পেতে পারে।

এই সব বিষয় নারীদের ভূমির মালিকানা পাওয়ার সুযোগকে সীমিত করছে। নারীরা সাধারণত পুরুষের সঙ্গে (বাবা বা স্বামী) সম্পর্কের সূত্র ধরে ভূমি ব্যবহারের অধিকার অর্জন করে এবং ওই অধিকার নির্ভর করে সম্পর্কের অবস্থার ওপর। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীরা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, যদিও সামাজিক মূল্যবোধ এবং প্রথা নারীদের গতিশীলতা ও শ্রম বাজারের সুযোগ সীমিত করেছে। নারীরা বীজ নির্বাচন, শস্য সংরক্ষণ, সাংসারিক উৎপাদন এবং গৃহপালিত পশুর দেখাশোনার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। তবে নারীর এই অবদানগুলোকে বিবেচনা করা হয় নিছক সাংসারিক কাজ বলে। বাংলাদেশে শ্রমের ক্ষেত্রে এখনো এই লৈঙ্গিক বিভক্তি থাকলেও বিষয়টি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। নারীরা ক্রমেই আরও সক্রিয় হচ্ছে, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মতো ক্ষেত্রগুলোতে তাদের দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া জটিল ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি একটি কঠিন আইনি প্রক্রিয়া যা জমি নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে ধীরগতির করে তোলে। তথ্য অধিকার আইন আইন ব্যবহার করে প্রশাসনিক বিধিনিষেধের সমাধান করা যেতে পারে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবের পাশাপাশি কৃষি কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা নারীদের কার্যকর উৎপাদন সামর্থ্যের উন্নয়নে ঘাটতির জন্য দায়ী। অধিকন্তু পারভীনের সমীক্ষায় (সাল ২০০১; উদ্ধৃত, হালিম ২০১৩) দেখা যায়, নারীরা বর্গাচাষিদের সঙ্গে লেনদেন করা, উৎপন্ন শস্য বিক্রি করা বা জমি দূরে হলে সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কেলকার (২০০৯; উদ্ধৃত, হালিম ২০১৩) উল্লেখ করেন, ব্যবহারের নিশ্চিত অধিকার না থাকায় (যার জন্য দায়ী আইন) জমির উন্নয়নে নারীরা নিজের অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না। এমনভাবে প্রকল্প নেওয়া

উচিত যেখানে নারীদের ‘কৃষক’ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নতুন প্রযুক্তির সম্প্রসারণ প্রয়োজন এবং তথ্য শুধু পুরুষদের নয়, নারীদেরও দিতে হবে। এভাবে ভূমির সঙ্গে নারীদের সৃষ্টিশীল অন্তর্ভুক্তি উৎপাদনকে পরিমাণ ও গুণগত উভয় দিকে বাড়িয়ে দিতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে নারীরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে কৃষি সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারীদের বাদ পড়ে যাওয়া ও অধীনস্থ হয়ে থাকার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বিভিন্ন পন্থায় তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করা যেতে পারে। বিভিন্ন নারীবাদী মতবাদ বিশেষ করে নাগরিকত্ব ও জাতীয়তাবাদ বিষয়ক নারীবাদী তাত্ত্বিকদের দাবি, নারীদের পুরুষের মতোই অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে হবে। জ্ঞান ও যৌক্তিকতার বাইরে রেখে নারীর স্বকীয় পরিচয়কে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মোকাবিলায় নারীদের খুব কম বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গায়ই দেওয়া হয়। অধিকন্তু লিঙ্গ বৈষম্যজাত ধারণা বা মনোভাব নারীর অধস্তন অবস্থান এবং সমাজ থেকে বাদ পড়ার প্রবণতাকে আরও জোরদার করে। বৈষম্যের কারণকে নিছক প্রাকৃতিক বা জৈবিক হিসেবে আখ্যা দিয়ে একে অরাজনৈতিক বলে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। (হালিম, ২০১১)।

২০১২ সালের ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের লিঙ্গ বৈষম্য সূচকের বৈশ্বিক তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৮৬ তম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এ বৈষম্যের হার বাংলাদেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (শ্রীলঙ্কার পরে)। তবে এ ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ (১)। মৌলিক শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ বেশ ভালোভাবেই এমডিজি (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য) অর্জনের পথে। তবে এখনো কিছু বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। ঘরে-বাইরে শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্য এবং অবিচার এখনো চলছে। শ্রেণি, জাতিগত এবং ধর্মীয় বৈষম্য লিঙ্গভিত্তিক সংকটগুলোর মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। দুর্নীতি ও রাজনৈতিক চাপে জর্জরিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো দরিদ্র নারীর জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় হয় অক্ষম কিংবা সেই ইচ্ছাই

পারিবারিক সহিংসতা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এদেশের শতকরা ৪৬ ভাগ নারী বিভিন্ন বয়সে নানাভাবে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়। পরিবারের ভেতরে কোনো বয়স্ক পুরুষ সদস্য, স্বামীর আত্মীয়, সে পুরুষ বা নারী যে হোক– যদি কোনো নারীকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে, তাকে আঘাত করে, যৌন হয়রানি করে, আর্থিকভাবে অবহেলা করে– এ সবই পারিবারিক সহিংসতার আওতায় পড়ে।

তাদের নেই। ন্যায়বিচার পেতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করতে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। কিছু এনজিওর সহায়তায় নারীরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সহিংসতাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে তথ্য চাওয়া শুরু করেছে।

*৩ গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১২, ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস অব বাংলাদেশ (RIB)’র সহায়তায় নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার তাহেরা বেগম তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সৈয়দপুর থানা থেকে তথ্য চেয়েছিলেন। তিনি ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত নারী নির্যাতনের কতোটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তার তালিকার একটি ফটোকপি চেয়েছিলেন। থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) তাহেরার আবেদন গ্রহণ করেছিলেন, তবে আবেদন গ্রহণের কোনো প্রাপ্তিস্বীকারপত্র দেননি। পরে তাহেরা RIB’র একজন উন্নয়ন কর্মীর সহায়তায় ওই বছরের ৩০

জুলাই রেজিস্টার্ড ডাকযোগে ওই একই আবেদন সৈয়দপুর থানায় পাঠান।

২০ কর্মদিবসের মধ্যে তথ্য না পেয়ে তাহেরা তথ্য অধিকার আইনের সেকশন ২৪ অনুযায়ী এ বিষয়ে আপিল করেন নীলফামারীর পুলিশ সুপারের কাছে। সেখানেও তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়ে তাহেরা এই আইনের সেকশন ২৫ অনুযায়ী তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন। শুনানির সময় তাহেরা অভিযোগ করেন, তিনি শুধু তথ্য পেতে ব্যর্থই হননি, বরং তাকে নানা বিড়ম্বনারও শিকার হতে হয়েছে। কমিশনের শুনানিতে সৈয়দপুর থানার তথ্য দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শপথ নিয়ে বলেন, তিনি থানায় তাহেরার কাছ থেকে কোনো আবেদন পাননি। বরং তথ্য কমিশনের কাছ থেকে সমন পাওয়ার পরই কেবল বিষয়টি জেনেছেন। শুনানির দিনে ওসি তাহেরার কাঙ্ক্ষিত তথ্য নিয়ে হাজির হন এবং এভাবেই অভিযোগটির নিষ্পত্তি হয়।

কার্যকরভাবে এই আইন ব্যবহারে নারীদের সক্ষমতা বাড়াতে কর্মকৌশল হাতে নেওয়া প্রয়োজন। সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে সামাজিকভাবে বঞ্চনার শিকার সর্বস্তরের নারীদের বৈষম্য ও হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এটা দরকার। নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য একটি সামাজিক বিষয়, যা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। এ কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য নির্মূলে জনগণের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন। মূলধারার সমাজে আদিবাসী নারীদের প্রতি বৈষম্য নির্মূলে সুশাসন ও পরামর্শের প্রয়োজন রয়েছে। এ ছাড়া নারীর প্রতি সহিংসতা, উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার, ভালো স্বাস্থ্যসেবা, সমান মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তার মতো ইস্যুগুলো বিবেচনা করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন কর্মসূচিতে নারীদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রক্ষাকবচগুলোর সুবিধা নিতে পারে। তথ্য অধিকার আইন আন্দোলনে আদিবাসী নারীদেরও যুক্ত করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের নেটওয়ার্ক জোরদার, সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জাতীয় পর্যায়ের অ্যাডভোকেসি নেটওয়ার্কগুলোতে অবদান রাখায় সক্ষম হয়। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের নেটওয়ার্কগুলো নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করার জন্য প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া নারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার ক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করছে। গণমাধ্যম এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ

১. হালিম, সাদেকা, ২০১৩' উইমেন'স ওনারশিপ রাইট অ্যান্ড অ্যাকসেস টু ল্যান্ড ইন বাংলাদেশ,' ইন উইমেন, ল্যান্ড অ্যান্ড পাওয়ার ইন এশিয়া (সম্পাদনা) জি. কেলকার অ্যান্ড এম. কৃষ্ণরাজ, রাউটলেজ, লন্ডন, নিউইয়র্ক

২. -------২০১১ স্ট্যাটাস অব হিন্দু উইমেন: ক্ষিয়ারস অব হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন ইন বাংলাদেশ, ইন মাইনরিটিস অ্যান্ড দ্য স্টেট চেঞ্জিং সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ অব বেঙ্গল, (সম্পাদনা) এ. দাসগুপ্ত, এম.টি তোগায়া অ্যান্ড এ. বারকাত। এসএজিই পাবলিকেশনস ইন্ডিয়া. দিল্লি, পিপি. ৮৭-১০২.

-------২০০৬ (এ) '*অ্যাকসেস টু জাস্টিস: সিচুয়েশন অব রুরাল উইমেন অ্যান্ড আরবান-রুরাল মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কারস ইন বাংলাদেশ,*' ইন "লিগ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট-এ ওয়ে আউট অব পভার্টি," দ্য নরওয়েজিয়ান মিনিস্ট্রি অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স, ডিসেম্বর ২০০৬-ইস্যু ২.

২০০৬ (বি). *সিচুয়েশন অব গারো উইমেন: সাম অবজারভেশনস*, ইন ইন্ডিজেনাস পিপলস হ্যাভ দ্য রাইট টু টেরিটরি ল্যান্ড অ্যান্ড ন্যাচরাল রিসোর্সেস, সলিডারিটি, বাংলাদেশ। ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম, ঢাকা, বাংলাদেশ।

----------, অ্যান্ড কবির, এইচ. আরিফুল, ২০০৫. *গ্লোবালাইজেশন, জেন্ডার অ্যান্ড লেবার মার্কেট: সাম এভিডেন্স ফ্রম আরএমজি সেক্টর*, ইন সোশ্যাল সায়েন্স রিভিউ, দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, পার্ট-ডি, ভলিউম. ২২ নং ১, জুন ২০০৫, পিপি ২৯-৪৪.

কেলকার, গোবিন্দ, ২০০৯. দ্য ফেমানাইজেশন অব এগ্রিকালচার ইন এশিয়াঃ ইমপ্লিকেশনস ফর উইমেন'স এজেন্সি অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি। ইউএনআইএফইএম সাউথ-এশিয়া রিজিওনাল এশিয়া, নিউ দিল্লি, ইন্ডিয়া।

নাজনীন, সোহেলোা, ২০০৪. জেন্ডার রিলেশনস ইন বাংলাদেশ: দ্য হাউসহোল্ড অ্যান্ড বিয়ন্ড, ডাউরি, উইমেন'স প্রোপার্টি রাইটস অ্যান্ড সালিশ, এ লিটারেচার রিভিউ। কেয়ার বাংলাদেশ।

পারভিন, শাহনাজ, ২০০৮. *অ্যাকসেস অব রুরাল উইমেন টু প্রোডাক্টিভ রিসোর্সেস ইন বাংলাদেশ: এ পিলার অব প্রমোটিং দেওয়ার এমপাওয়ারমেন্ট*, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব রুরাল স্টাডিজ, ভলিউম. ১৫।

সারওয়ার, জি. মোঃ. এটএল ২০০৭. উইমেন'স রাইটস টু ল্যান্ড ইন বাংলাদেশ: রোলস, লিমিটেশনস অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন, উন্নয়ন অন্বেষণ (দ্য ইনোভেটরস), ধানমন্ডি ঢাকা।

তথ্য অধিকার আইন
তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ

মো. মুস্তাফিজুর রহমান
পরিচালক ইনোভেশন
অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম

তথ্য কমিশন-এর কাজ তথ্য অধিকার আইন এবং এ আইনের আওতায় প্রণীত বিধিমালার প্রয়োগ ও কার্যক্রম ঠিকমতো চলছে কিনা তা দেখা ও পর্যবেক্ষণ করা। তথ্য কমিশন-এর মূল কাজগুলো হচ্ছে মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে জানানো, তাদের প্রভাবিত করা ও সমস্যা সমাধান করা (লোকের যৌক্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তি করা, যারা মনে করে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে) এবং প্রয়োগ করা (তাদের বিরুদ্ধে আইনের প্রয়োগ ঘটানো যারা তাদের দায়বদ্ধতা উপেক্ষা বা অস্বীকার করে)।

"তথ্য অধিকার" বলতে বোঝায়, যে কোনো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার অধিকার যেখানে ছাপা/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইলে/ফ্যাক্সে/সিডিতে বা অনুমোদিত অন্য উপায়ে তথ্য পাওয়ার সুযোগ মেলে।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯-এর মৌলিক উদ্দেশ্য হলো পাবলিক, স্বায়ত্তশাসিত ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি বা বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা তুলে ধরার মাধ্যমে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করা। এর মাধ্যমে দুর্নীতি কমানো ও সত্যিকার অর্থে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই এর চূড়ান্ত লক্ষ্য।

তথ্য অধিকার আইনের জন্য আইসিটি

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান নাগরিকের চাহিদা অনুযায়ী পাবলিক ইনফরমেশন সরবরাহ করবে। এরই আলোকে অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন-২ এবং এর সহযোগীদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার একটি বহুপ্রতীক্ষিত 'তথ্য বাতায়ন' গড়ে তুলেছে। এখানে নাগরিকের জন্য সব ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে। (link:http://www.bangladesh.gov.bd)

আইসিটির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য পৌঁছে দিতে সরকারের গৃহীত অনেকগুলো উদ্যোগের মাত্র একটি হলো এই তথ্য পোর্টাল। অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে আছে:

- http://www.infocom.portal.gov.bd: তথ্য কমিশনের কেন্দ্রীয় পোর্টাল, এখানে তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধির তথ্য এবং কমিশনের কাছে তথ্য চাওয়ার ফরম রয়েছে।
- http://www.infokosh.portal.gov.bd: কেন্দ্রীয় তথ্য বাতায়ন বা পোর্টাল যেখানে নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য বিভিন্ন তথ্য রাখা আছে। এখানে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন, সংস্কৃতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাতের এবং বিষয়ের তথ্য রয়েছে।

প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে বাস্তবে রূপ দিতে তথ্য কমিশনের বেশ কয়েকটি উদ্যোগের একটি হচ্ছে প্রস্তাবিত ‘তথ্য জানালা’।

‘তথ্য জানালা’ ব্যবস্থা চালু করার মূল উদ্দেশ্য হলো আইসিটির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত তথ্য সরবরাহ, সেবা প্রদান ও আপিল প্রক্রিয়াকে সহজ করা যাতে নাগরিককে দ্রুত, গোছানো, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ তথ্য সেবা দেওয়া নিশ্চিত করা যায়।

‘তথ্য জানালা’ হবে তথ্য কমিশনের একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করবে। আইনে উল্লিখিত যে কোনো সরকারি সংস্থা বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য পেতে এটা সহায়তা করবে এবং চাহিদা/প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তথ্য খুঁজে পেতে সহায়ক হবে।

তথ্য জানালার প্রস্তাবিত অনুষঙ্গগুলো

- তথ্য প্রদানকারী ইউনিট (আইপিইউ) ব্যবস্থাপনা

  তথ্য প্রদানকারী ইউনিট (আইপিইউ) বলতে বোঝাবে সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকা বিভাগ, অধিদপ্তর বা সংস্থার প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়; অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়।

তথ্য প্রদানকারী ইউনিট (আইপিইউ) তথ্যের জন্য আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করবে। প্রতিটি আইপিইউ-এর একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) থাকবেন যিনি তথ্য চাইতে আসা ব্যক্তিকে সব ধরনের যৌক্তিক সহায়তা দেবেন।

তথ্যপ্রার্থীর অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা

এই “তথ্য জানালা” ব্যবস্থা ব্যবহার করে কেউ তথ্য চাইলে এই ব্যবস্থাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওই তথ্যপ্রার্থীর জন্য একটি অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা করতে শুরু করবে। বিভিন্ন ওয়েব সাইট ও পোর্টালের ‘আইসি ইনফরমেশন সার্ভিস বক্স’ থেকে আবেদনকারী এই ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারবে না।

এই ব্যবস্থা ব্যবহার করে একজন আবেদনকারী প্রথমবার তথ্য চাইলেই তার অ্যাকাউন্ট চালু হয়ে যাবে। আবেদনকারীকে ই-মেইল এবং এসএমএসের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক নোটিফিকেশন পাঠানোর মাধ্যমে তাকে এ ব্যাপারে জানানো হবে। পরে আবেদনকারী তার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে প্রোফাইল আপডেট করা, আবেদন দেখা, সেবা সম্পর্কিত নোটিফিকেশন দেখা ও পাঠানো, আরো তথ্যের জন্য আবেদন করা এবং নিজের অ্যাকাউন্টের দেখভালের মতো অনেক কাজ করতে পারবেন।

আপিল প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা

এই কমপোনেন্ট ব্যবহার করে অনুমোদিত ব্যবহারকারী তথ্য কমিশনের জন্য আপিল প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন। যদি কোনো আবেদনকারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পান বা প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হন কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোনো সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন, সেক্ষেত্রে তিনি আপিল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপিল করতে পারেন, যিনি হতে পারেন এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার/মূল কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান, সিস্টেম-এ যাকে ট্যাগ করা আছে। সরকারি কর্তৃপক্ষের আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের শুনানি শেষে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

কোনো আবেদনকারী যদি মনে করেন তাকে অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছে বা আইনে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তার চাহিদার বিষয়ে কোনো সদুত্তর দেওয়া হয়নি; বা তার কাছ থেকে যে পরিমাণ ফি আদায় করা হয়েছে তা অযৌক্তিক, সেক্ষেত্রে তিনি তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। এই মডিউলটি আইসির জন্য অভিযোগ ব্যবস্থাপনার কাজ করবে।

তথ্য সেবা পোর্টাল

নাগরিকদের জন্য একটি জনমুখী মডিউল দরকার যেখানে তারা তথ্য কমিশনের সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার ম্যাপ ও তথ্য অধিকার আইন আইন সম্পর্কে তথ্য পাবেন। এই মডিউলে একটি অনুমোদনকারী ইউনিট বসানো হবে যার মধ্য দিয়ে অনুমোদিত ব্যবহারকারীরা সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারবেন এবং তাদের নিজস্ব ওয়েব .. (পৃষ্ঠা ৩ দেখুন)

... অ্যাকাউন্ট ম্যানেজ করতে পারবেন। প্রাথমিকভাবে সিস্টেম-এ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে যা দিয়ে এই মডিউলটি প্রস্তুত করা হবে:

- আবেদন/অভিযোগ/আপিলের তালিকা
- আবেদন/অভিযোগ/আপিল নিষ্পত্তির তালিকা
- তারিখ/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রতিষ্ঠান/আবেদন/অভিযোগ/আপিল-এর সব টেক্সটের মাধ্যমে খোঁজার সুযোগ
- সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার ম্যাপ
- আইসি সেবার সংবাদ, সার্কুলার, নোটিশ
- তথ্য অধিকার আইন আইন
- আইসি সেবা ম্যানুয়াল

ড্যাশবোর্ড ও রিপোর্ট ব্যবস্থাপনা

যেখানে চাহিদা অনুযায়ী খাতভিত্তিক ও হালনাগাদ তথ্য দেখানো হয়- সেটাই ড্যাশবোর্ড নামে পরিচিত। সেবা প্রদান কাজের অগ্রগতি তদারকি, পরিসংখ্যান সমৃদ্ধ তথ্য দেখা ও লগ ব্যবস্থাপনায় এটা সহায়তা করে। তারপরও ব্যবহারকারী এবং তাকে দেওয়া সুবিধার ওপর নির্ভর করে এই তথ্য কমবেশি হয়। উদ্দেশ্য ও টার্গেট ব্যবহারকারীকে বিবেচনায় নিয়ে আইসি আলাদা আলাদা রিপোর্ট প্রস্তুত করবে। এই সিস্টেম সম্ভাব্য সব রুটিন ও নন-রুটিন রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত করবে।

নাগরিকের ক্ষমতায়ন ও তাদের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সত্যিকার অর্থেই একটি অনন্য পদক্ষেপ। একে জনগণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর পক্ষ থেকে জোরালো উদ্যোগ দরকার। এখন জনগণকে তথ্য অধিকার আইন আইন ২০০৯-এর বিষয়ে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওর ওপর। এর ফলে জনগণ এই আইনের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো সেবা আদায় করে নিতে পারবে। ■

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রেক্ষিত ও পদক্ষেপ

সানজিদা সোবহান

তথ্য অধিকার আইনের খসড়া প্রণয়নে গঠিত কমিটির অন্যতম সদস্য

সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত, চুক্তি নথিপত্র হিসাব-নিকাশ, রেকর্ড, আয়-ব্যয় সবকিছু জানার অধিকার আমাদের আছে। প্রয়োজন হলে সরকারের বিভিন্ন নথিপত্র দেখার ও পাওয়ার অধিকারও আছে। শুধু সরকারি নয়, সরকারি ও বিদেশি ফান্ডে চলা এনজিও থেকেও তথ্য পাবার অধিকার জনগণের আছে।

“তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” আইন পাস হওয়ার পেছনের ঘটনা অনেকেরই অজানা। আইন পাস হওয়ার আগে থেকে শুরু করে গেজেট আকারে প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত অনেকগুলো আইনি ও প্রশাসনিক ধাপ অনুসরণ করতে হয়। এটি সম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিষয়। যারা তথ্য অধিকার আইন হওয়ার জন্যে অনেকদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন তাদের অনেকে সেই ঘটনাগুলোর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। একটি আইন পাস করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ থাকে। তবে, এই নিবন্ধে মূলত ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ পাস হওয়ার নেপথ্যে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো ও সুশীল সমাজের ভূমিকা ও উদ্যোগ নিয়ে কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের আইন কমিশন ২০০২ সালে ”তথ্য অধিকার বিল” নামে একটি খসড়া প্রণয়ন করে, কিন্তু ২০০৭-২০০৮ সাল পর্যন্ত ঐ খসড়ার কোনো অগ্রগতি জানা যায়নি। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার নিয়ে জনসমাজে আলোচনা কিন্তু শুরু হয়েছিল বহু

আগেই, অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে। প্রাথমিক পর্যায়ে তথ্য অধিকারের বিষয়টা বেশি আলোচিত হতো গণমাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতার দৃষ্টিকোনো থেকে। তথ্য অধিকার শুধু মত প্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত বিষয় নয়; এটি জনগণের মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও সরাসরি জড়িত -এই দৃষ্টিভঙ্গি মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে আলোচিত হতে থাকে ২০০৪ সালের শেষ দিক থেকে।

২০০৫ সালে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী দাতা সংস্থা) সুশাসন ও মানবাধিকার বিষয়ে সম্মেলনের আয়োজন করে। এই আয়োজনে বহু বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাগরিক সমাজসহ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) ১০০টি সহযোগী সংস্থা অংশগ্রহণ করে। তথ্য পাওয়ার বিষয়টি সরাসরি মানবাধিকার এবং সুশাসনের সঙ্গে জড়িত তাই মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পক্ষে তখন 'তথ্য অধিকার' নিয়ে কাজ করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। এই কারণে ২০০৫ সালের সম্মেলনটির মূল আলোচনার বিষয় ছিল তথ্য অধিকার। সম্মেলনের শেষে অংশগ্রহণকারী সবাই একমত হয়েছিলেন যে তথ্যপ্রাপ্তি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনে, ফলে সহজে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করা যায়।

নেটওয়ার্কিং

যেহেতু সে সময়ে বাংলাদেশে কোনো সংস্থা এককভাবে শুধু তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করতো না, তাই ভারতের দিল্লি ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভস (CHRI)-এর সঙ্গে এমজেএফ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। ভারতে তখন সবেমাত্র তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫ পাস হয়েছে। CHRI ভারতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, প্রয়োগ এসব নিয়ে খুবই সক্রিয় সংস্থা হিসেবে সুপরিচিত। CHRI-এর সঙ্গে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে ভারতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং তা' কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে সে বিষয়ে ধারণা ও সহযোগিতা লাভ করা। পরে Article 19-এর সঙ্গেও এমজেএফ নেটওয়ার্ক স্থাপন করে। Article 19 এবং CHRI এই দু'টি সংস্থা বাংলাদেশের সুশীল সমাজ হতে যে খসড়া তথ্য অধিকার আইনের প্রস্তাব করা হয় তাতে মতামত দিয়ে খসড়াটিকে সমৃদ্ধ করেছিল।

তাৎক্ষণিক মতামত জরিপ

নেটওয়ার্ক স্থাপনের পাসাপাশি, প্রাথমিক পর্যায়ে একটা মতামত জরিপ (Rapid Assessment) করা হয়। এই মতামত জরিপের মাধ্যমে তথ্য অধিকারের অবস্থান জনসাধারণের মতামত, অভিপ্রায়, সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয়। তাছাড়া বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, গণমাধ্যম, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষক এবং বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের কাছে তথ্য অধিকার সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কী তা-ও এই জরিপে উঠে আসে। এছাড়া সে সময়ে তথ্য অধিকার নিয়ে কোনো কোনো সংস্থা কী ধরনের কাজ করছে, কীভাবে করছে, কী ধরনের অগ্রগতি হয়েছে এ বিষয়গুলোও মতামত জরিপের প্রতিবেদনে তুলে আনা হয়। আমার মতে, এই মতামত জরিপ এর ভিত্তিতে তৈরি করা প্রতিবেদনটি তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ শুরু ও অগ্রসর হওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মতামত জরিপের প্রতিবেদন থেকেই আন্দাজ করে নেওয়া সম্ভব হয় যে, তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করতে হলে কোন পর্যায় থেকে কীভাবে শুরু করতে হবে এবং কাদের নিয়ে কাজ করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হলে কী কী কাজ হাতে নিতে হবে সে সম্পর্কে একটি কর্মপরিকল্পনা বা রোড ম্যাপ তৈরি করতে প্রতিবেদনটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মূলদল (Core Group) গঠন

জরিপ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তৈরি করা রোড ম্যাপ স্পষ্ট একটি ইঙ্গিত দিল যে, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। এই কাজ একার পক্ষে সামলানো অসম্ভব। কী কী উদ্যোগ নিতে হবে সেগুলো বিবেচনায় এনে আইন, জনসচেতনতা এবং তৃণমুল পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি করার লক্ষ্যে তিনটি মূলদল (Core Group) গঠন হলো। আইন বিষয়ে কোর গ্রুপের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন দেশের তথ্যে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত আইনগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের আইন, বিচারিক পদ্ধতি প্রক্রিয়া ও

আর্থ-সামাজিক বিষয়ের নিরিখে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে উপযোগী একটি তথ্য অধিকার আইনের খসড়া দাঁড় করানো। আইন বিষয়ের মূলদলের সক্রিয় সদস্য ব্যারিস্টার তানজীব-উল-আলম, আইনটির খসড়া তৈরি করেন। পরবর্তী সময়ে এই খসড়ার ওপর কোর গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ড. শাহদীন মালিক, সুলতানা কামাল, ড. আসিফ নজরুল, ড. বারী মতামত দেন। এবারে খসড়াটির নামকরণ হলো সুশীল সমাজের খসড়া। খসড়াটি-কে আরো পোক্ত করার উদ্দেশ্যে ৬টি বিভাগীয় শহরে আইনজীবী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সাংবাদিক ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের সঙ্গে পরামর্শমূলক সভা করে তাঁদের মতামত নিয়ে খসড়াটি আরো সমৃদ্ধ করা হয়। এছাড়া CHRI এবং Article 19-এর অভিমত, মতামত এবং পরামর্শ খসড়াটির মধ্যে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সন্নিবেশ করে একটি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে খসড়া আইন তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়।

মিডিয়া বিষয়ক কোর গ্রুপ পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, টিভি টক শো, সেমিনার, গোল-আলোচনা টেবিল সবক্ষেত্রে তথ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা, বিতর্ক, তথ্যপ্রাপ্তির সুবিধা, তথ্যে প্রবেশাধিকার না থাকলে এর অসুবিধা– এগুলো আলোচনার সূত্রপাত করলেন; এসবের উদ্দেশ্য ছিল তথ্য অধিকারের আলোচনাকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা এবং তথ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সবাইকে জানানো। আমাদের দেশের কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন সিএইচআরআই (CHRI) থেকে প্রকাশিত Open Sesame বইটির বাংলা অনুবাদ করে নিয়মিত পত্রিকায় লিখতেন। ফলে, তথ্য অধিকার নিয়ে আলোচনা সর্বমহলে শুরু হলো।

মূলধারায় একীভূতকরণ (Mainstreaming)

তৃণমুল পর্যায়ে কর্মরত সংগঠনগুলো তাদের সকল কাজের সঙ্গে, পরিকল্পনার সঙ্গে তথ্য অধিকারকে সম্পৃক্ত করে কাজ শুরু করলেন। যেমন- প্রতিবন্ধী বা শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম বা প্রতিবন্ধী, শিশুদের মানসিক বিকাশ ও অধিকার, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, শ্রমজীবী-কর্মজীবী নারীদের নিয়ে সম্পৃক্ত সংস্থাগুলো তথ্যের প্রয়োজনীয়তা-বিশেষ করে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য-সেবার মান, পরিমাণ, উপাদান, জনগণের জীবিকার সঙ্গে তথ্যপ্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব, এই বিষয়গুলোতে মানুষকে সচেতন করার কাজগুলো বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো করতে থাকে। এছাড়াও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত অনেক ছোট-বড় সহযোগী সংগঠনের কার্যক্রমের সঙ্গে তথ্য প্রাপ্তির বিভিন্ন উদ্যোগগুলো সংযুক্ত করা হলো। ফলে এই সকল সংগঠন

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন, র‍্যালি, বিশেষ বিশেষ দিবসে তথ্য অধিকার নিয়ে আলোচনা, চলমান প্রশিক্ষণগুলোতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্তকরণ, এমনকি যে সমস্ত সংগঠন উঠান বৈঠকের আয়োজন করতো তারা উঠান বৈঠকেও নিয়মিতভাবে নির্ধারিত আলোচনার সঙ্গে তথ্য অধিকার নিয়ে আলোচনা করতো। জনগণকে তথ্য অধিকার সম্পর্কে জানানো ও জনগণের সচেতনতা বাড়ানোর কাজটি মিডিয়া এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো একই সময়ে পাসাপাশি করে যাচ্ছিল।

যোগাযোগ উপকরণ

তথ্য সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বাড়ানোর জন্যে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক টিভিসি তৈরি করে গণমাধ্যমে প্রচার ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বুকলেট, ছোট ছোট হ্যান্ড বই, লিফলেট, কার্টুন, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করে বেসরকারি সেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমনকি সরকারি অফিসগুলোতেও বিলি করা হতো। এমজেএফ হতে তথ্য অধিকার নিয়ে গান লেখা প্রতিযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া হলো; এসব কিছুর উদ্দেশ্য ছিল তথ্যের প্রতি মানুষকে আগ্রহী করে তোলা। তথ্য যে একটি মানবাধিকার- সকল ক্ষেত্রে তথ্যের প্রয়োজন আছে- এ বিষয়টি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদি জিইয়ে রাখা।

মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ

একটি পত্র দিয়ে সুশীল সমাজের তৈরি করা খসড়ার একটি কপি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলো। পত্রে অনুরোধ করা হলো, আইন কমিশনের প্রস্তুতকৃত ২০০২ সালের খসড়া বিলটির প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন করে আইন আকারে পাস করবার জন্যে। পত্রে আরো অনুরোধ জানানো হলো সুশীল সমাজের খসড়াটি যেহেতু বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের আলোকে, আন্তর্জাতিক ও দেশের অভ্যন্তরে বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন পেশাজীবী মহলের মতামত নিয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তৈরি করা তাই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে যেন খসড়াটিকে কাজে লাগানো হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আইন কমিশনের খসড়া বিলটি সংশোধন, পরিমার্জন করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব দেওয়ার জন্যে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে একজন যুগ্মসচিবকে আহবায়ক করে সাত (৭) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির অন্যতম সদস্যের মধ্যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটি তথ্য অধিকার আইনের খসড়া প্রস্তুত করে মার্চ ২০০৮ সালে একটি সেমিনারের মাধ্যমে খসড়ার ওপর সরকার ছাড়াও বিশিষ্ট নাগরিক, গণমাধ্যমসহ সকল মহলের মতামত সংগ্রহ করে। একই সময়ে ভারতের তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার ওয়াজাহাত হাবিবুল্লাহ সরকারি আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফরে এলে তাঁকে প্রধান অতিথি করে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনার আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে তথ্য অধিকার আইনের সুফল, বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের আইন প্রণয়ন কমিটির তৈরি করা খসড়া আইনের ওপর তাঁর অভিমত সঞ্চয় করা। তথ্য মন্ত্রণালয় কমিটির প্রস্তুতকৃত খসড়ায় সকল নাগরিকের মতামত, অভিমত সংগ্রহের জন্য খসড়াটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়।

বিকল্প ভাবনা

তথ্য অধিকার আইন পাস না হওয়া পর্যন্ত এবং আইন পাস হতে বিলম্ব হলে জনসাধারনের তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে একটা গবেষনামূলক কাজ করা হয়। বাংলাদেশে বিদ্যমান যে সমস্ত আইন, বিধি, প্রবিধি, নীতিসমূহে তথ্য প্রদানের বিষয়ে বলা আছে সেগুলো সংগ্রহ করে সংকলন করা হলো। এই কাজটি ব্যরিস্টার তানজীন করলেন। এই সংকলনটি করার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের তথ্যপ্রাপ্তিতে বিদ্যমান ও প্রচলিত আইন, বিধির ব্যবহারগুলো সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা।

তথ্য অধিকার ফোরাম

তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিকার খসড়াটি যথানিয়ম অনুসরণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠালে উপদেষ্টা পরিষদ কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব এনে বিলটিতে ১৮ জুন ২০০৮ তারিখে নীতিগত অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সংশোধনীর মধ্যে এমন কিছু প্রস্তাব

ছিল যা তথ্য অধিকারের চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। সে সময়ে তথ্য অধিকার নিয়ে যে সংগঠনগুলো এবং বিশিষ্ট নাগরিক সমাজ নিবিড়ভাবে কাজ করছিলেন তাঁরা অনুভব করেন যে, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া তথ্য অধিকারের মূল চেতনা সংরক্ষণ করে এমন একটি আইন পাস করানো সম্ভব নয়। এই তাড়না থেকে 'তথ্য অধিকার ফোরাম' গঠিত হয় ২০০৮ সালের ২১ জুলাই। মূলত তথ্য অধিকার ফোরামের সকল সদস্য তথ্য অধিকার আইন হওয়ার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করেছে। নীতিগত অনুমোদনের পরে ফোরাম অধ্যাদেশে কিছু সংশোধনীর ব্যাপারে বিভিন্ন দিক থেকে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট দাবি জানাতে থাকে। সুশীল সমাজের দাবি অনুযায়ী কিছু সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করে ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ তথ্য মন্ত্রণালয়ের খসড়া বিলটি অনুমোদন করলে অক্টোবর ২০০৮ সালে বিলটি 'তথ্য অধিকার অর্ডিন্যান্স ২০০৮'-গেজেটে আকারে প্রকাশিত হয়।

পরবর্তী সময়ে ২০০৯ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকার গঠন হলে, 'তথ্য অধিকার ফোরাম' অধ্যাদেশটিকে আইন আকারে পাস করানোর জন্য বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। তথ্য অধিকার ফোরামের পক্ষ থেকেও সরকারের নিকট আইনটিকে সংসদে পাস করবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ৯ম সংসদের ১ম অধিবেশনেই অধ্যাদেশটি আইন হিসেবে পাস করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হওয়া বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি যুগান্তকরী ঘটনা। এই আইনের মাধ্যমে জনগনের মানবাধিকার যেমন নিশ্চিত হয়েছে তেমনি সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও এর অবদান আছে। এখন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের প্রাপ্য সেবাগুলো সম্পর্কে কোনো অনিয়ম হলে তা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের গুণগতমান, পণ্যের উপাদান এগুলো জনসাধারণ এখন জানতে চাইতে পারেন।

তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তথ্যের সহজলভ্যতার বিষয়টি জড়িত। এক্ষেত্রে সরকার যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে; প্রায় প্রতিটি জেলায় ই-ফাইলিং ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। ফলে তথ্য সংরক্ষন, সেবা ও তথ্য প্রদান সহজতর হয়েছে। প্রায় সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, কার্যালয়ে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে। অনেক দপ্তরের নাগরিক সনদ হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরকারি কার্যালয়গুলোতে ২১ (একুশ) হাজার কর্মকর্তাকে তথ্য দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। অতি সম্প্রতি কিছু নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ বা উন্মুক্তকরণ নির্দেশিকা তৈরি করা হয়। ক্রমান্বয়ে মন্ত্রণালয়ের এই সংখ্যা আরো বাড়বে। জনগণকে সহজে তথ্য দেওয়ার জন্য তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী এই উদ্যোগগুলো নেওয়া হচ্ছে। আইন অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্যে সরকারি পর্যায়ের প্রস্তুতি এখন প্রায় সম্পন্ন।

এই আইনটির খসড়া থেকে আইন আকারে পাস হওয়া পর্যন্ত সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো যেভাবে সক্রিয় ছিল, বর্তমানে আইনটি পাস হওয়ার পর থেকে তেমন সক্রিয় দেখা যায় না। সরকারি পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে যে পরিমাণ কাজ হচ্ছে, সে পরিমাণ উদ্যোগ বেসরকারি পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে না। তথ্য অধিকার আইনের বলে গত বছরে ৭০০০০ (সত্তর হাজার) তথ্য সম্পর্কে জানতে চেয়ে বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন পড়েছে (সূত্র: প্রথম আলো ২৮ আগস্ট ২০১৫)। এটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং একই সঙ্গে আশাব্যঞ্জক খবর। তথ্য পাওয়ার জন্যে জনসাধারন এখন উৎসাহিত হচ্ছেন এখবর তারই ইঙ্গিত বহন করে। পাওয়া তথ্যগুলো কাজে লাগিয়ে জীবনমানে, জীবনযাত্রায় কী ধরনের পরিবর্তন বা উন্নতি হয়েছে সেগুলো মডেল/উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে তথ্যের ব্যবহার এবং এর উপযোগিতা সম্পর্কে জনসাধারণ জানতে পারবে। তথ্যপ্রাপ্তি এখন কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়, তথ্যের সঠিক ব্যবহার এখন বড় চ্যালেঞ্জ। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আরো একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নির্ভুল পদ্ধতিতে তথ্যের জন্য আবেদন করা। এই চ্যালেঞ্জগুলো অবসানের জন্য সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজন আছে। তথ্য অধিকার ফোরাম এই উদ্যোগ নিতে পারে। ■

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য প্রদানের ব্যতিক্রমসমূহ (ধারা ৭)

ধারণা জরিপ থেকে পাওয়া সুপারিশ

আদিবাসীদের সমঅধিকার, লাভ-ক্ষতির তথ্য জানার

গণতান্ত্রিক দেশে উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের মতামত ও সক্রিয় অংশগ্রহণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় এবং জনঅংশগ্রহণ সুশাসনের একটি মৌলিক শর্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণের বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর, যেমন আদিবাসীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের এই মৌলিক শর্তটি পূরণ হচ্ছে না। সুশীল সমাজ কর্তৃক 'তথ্য অধিকার' বিষয়ক প্রস্তাবিত আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, এই আইন চালু হওয়ার পর থেকে নতুন প্রকল্প, নীতি, স্কিম, কর্মসূচি ইত্যাদি যা জনগণকে সাধারণভাবে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তা সরকারি কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবে। (ধারা ৪{১, এম})

যেহেতু জনগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক তাই রাষ্ট্রের সকল তথ্যে প্রবেশ করতে পারা তার অধিকার। গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে জনগণের ক্ষমতায়ন খুব দরকার। তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ জনগণের ক্ষমতায়নের প্রধানতম শর্ত। উপরন্তু জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে দুর্নীতি হ্রাস পায় ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তথ্য জানার অধিকার জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠাও সুনিশ্চিত করে।

তথ্য অধিকার আইনে বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, এই আইনকে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধাসংক্রান্ত অন্য সব আইনের উপরে অবস্থান দেওয়া হয়েছে এবং আইনের প্রস্তাবনায় এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এসব বিষয় তথ্য অধিকার আইনের মূল স্পিরিটকে আমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

আইনের ৪ ধারায় তথ্য প্রদানে বাধ্যবাধকতা আরোপের পাসাপাশি ৭ ধারায় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্মে ২০টি উপধারা সংযোজিত হয়েছে। সেখানে দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার; আইনের প্রয়োগ; অপরাধ বৃদ্ধি; জনগণের নিরাপত্তা; সুষ্ঠু বিচারকার্য; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা; আদালতের নিষেধাজ্ঞা; আদালত অবমাননা; তদন্তকাজে বিঘ্ন; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানি; মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিবেচনায় কতিপয় তথ্য প্রদান বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়েছে। আইন বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এবং তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত কিছু সংখ্যক অভিযোগ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ধারা ৭-এর উল্লেখ করে তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকার উদাহরণ তৈরি হয়েছে, যার অনেক ক্ষেত্রেই ধারা ৭-কে ভুলভাবে ব্যবহার, না বুঝে ব্যবহার বা এর অপব্যবহার করা হয়েছে। জনগণ তো বটেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষও এই ধারা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের এ পর্যায়ে এসে ধারা ৭-এর বাধানিষেধগুলো অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু ভুলভাবে ব্যবহার, না বুঝে ব্যবহার বা অপব্যবহার নয়, অন্য কারণেও ধারা ৭-এর উপধারাগুলো সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলছেন আইন বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ।

এই সমস্যাগুলো অনুসন্ধানের জন্য এমআরডিআই, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এবং তথ্য কমিশন বাংলাদেশের সহযোগিতায় 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর 'ধারা ৭' বিষয়ে একটি 'ধারণা জরিপ' শেষ করেছে। ধারণা জরিপে ধারা ৭-এর ব্যবহারিক সমস্যা অনুসন্ধানের পাশাপাশি এর উপধারাগুলো অতি বিস্তৃত বা অতি সংক্ষিপ্ত কি না; সমজাতীয় বিষয় বিভিন্ন ধারায় সংযোজিত হয়েছে কি না; কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে কি না; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বিভিন্ন দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে উপধারাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না; প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বাধানিষেধ যুক্ত করা হয়েছে কি না; আরো বাধানিষেধ যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না; কোনো কিছু সমাপতিত বা বিভক্ত হয়েছে কি না, বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে উপধারা প্রযোজ্য হয় না, তা ব্যবহার করে তথ্য প্রদান না করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ধারণা জরিপের পদ্ধতি হিসেবে বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview-KII), ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, বিভাগীয় পর্যায়ে গোলটেবিল আলোচনা ও জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভাগীয় গোলটেবিল আলোচনাগুলো এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে এমআরডিআই-এর পক্ষ থেকে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপান করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ধারিত আলোচক, আমন্ত্রিত অতিথিরা এবং অংশগ্রহণকারী আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় তাঁরা তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ বিষয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন এবং সুপারিশ প্রদান করেন। এ ছাড়া ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও বিষয় সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকেও সুপারিশ পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশগুলোর আলোকে একটি চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। সুপারিশমালা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের মূল স্পিরিটকে বিবেচনায় রাখা হয়। পাসাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশের তথ্য অধিকারসংক্রান্ত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাপেক্ষে চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছে। ধারণা জরিপের পদ্ধতিগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুপারিশগুলোর যৌক্তিকতা ও প্রদত্ত সুপারিশে সহমত পোষণকারীর সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এই সুপারিশগুলো তথ্য কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

এই প্রকাশানায় ধারণা জরিপের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় গোলটেবিল আলোচনাগুলো ও জাতীয় সেমিনারে আলোচনার প্রতিবেদন ও

সুপারিশগুলো, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো, সকল আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার এবং ধারণা জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত সুপারিশমালা সংকলিত হয়েছে।

গোলটেবিল আলোচেনাগুলো ও সেমিনারে আলোচনার সময় আলাচকরা ধারা ৭-এর পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইনের অন্যান্য বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। প্রতিবেদনে প্রত্যেকের আলোচনা থেকে শুধু ধারা ৭-সংশ্লিষ্ট আলোচনার অংশটুকু তুলে আনা হয়েছে।

দেশ ও জনগণের বৃহত্তর মঙ্গলের স্বার্থে কিছু তথ্য গোপন থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বিধান ব্যবহার করে যদি জনগণের জানার অধিকার খর্ব করা হয়, তাহলে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। সুতরাং জনগণের জানার অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

ধারণা জরিপের পদ্ধতি

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ বিষয়ক এই ধারণা জরিপটি সম্পন্ন করতে মানবাচক (Qualitative) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

১) বিভাগীয় পর্যায়ে গোলটেবিল আলোচনা

২) ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

৩) বিষয় সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview-KII) ও

৪) জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার

বিভাগীয় পর্যায়ে গোলটেবিল আলোচনা

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ ও এর ব্যবহার বিষয়ক মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা, ধারণা, মতামত ও সুপারিশ তুলে আনতে ঢাকা বিভাগ ছাড়া অন্য ছয়টি বিভাগে ছয়টি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হয়। খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনাগুলোয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভিন্ন জেলার জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিনিধি, সাংবাদিক, আইনজীবী, আদিবাসী নেতা, মানবাধিকারকর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

ধারণা জরিপের অংশ হিসেবে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের ছয়টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি গ্রুপে ১০ জন করে অংশ নেন। গ্রুপগুলো হলো, সাংবাদিক, বেসরকারি প্রতিনিধি, আদিবাসী নেতা, পেশাজীবী, সরকারি কর্মকর্তা ও যুবকর্মী। আলোচনার পাসাপাশি অংশগ্রহণকারীরা লিখিতভাবে তাদের সুপারিশগুলো তুলে ধরেন।

বিষয় সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার

একটি মানবাচক (Qualitative) প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট ৫০ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার

ঢাকায় একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে ঢাকা ও বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিনিধি, সাংবাদিক, আইনজীবী, আদিবাসী নেতা, মানবাধিকারকর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সেমিনারে বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া ফলাফল উপস্থাপন করা হয়।

সুপারিশমালা

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারকারী এবং তথ্য প্রদানকারী

উভয়পক্ষ থেকেই অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে এই আইনের ধারা ৭। এই ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি ভুলভাবে প্রয়োগ ও এর অপপ্রয়োগ এবং এর প্রযোজ্যতা, কিছু উপধারার প্রয়োজনীয়তা, ধারার আওতা, ভাষাগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে বেশি। তাই ধারা ৭-এর ব্যবহারিক সমস্যাগুলোর অনুসন্ধান ও তার সমাধানকল্পে সুপারিশ আহরণের জন্য এই ধারণা জরিপ পরিচালিত হয়। এই জরিপে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর সীমাবদ্ধতা, এই ধারার বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহারের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

পরিচালিত ধারণা জরিপের মাধ্যমে ধারা ৭-এর উপধারাগুলো অতি বিস্তৃত বা অতি সংক্ষিপ্ত কি না; সমজাতীয় বিষয় বিভিন্ন ধারায় সংযোজিত হয়েছে কি না; কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে কি না; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বিভিন্ন দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে উপধারাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না; প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বাধানিষেধ যুক্ত করা হয়েছে কি না; আরো বাধানিষেধ যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না; কোনো ওভারল্যাপিং বা স্প্লিটেড হয়েছে কি না বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে উপধারা প্রযোজ্য হয় না তা ব্যবহার করে তথ্য প্রদান না করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ধারণা জরিপের অংশ হিসেবে খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ছয়টি গোলটেবিল আলোচনা, ছয়টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ঢাকায় একটি সেমিনার ও বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview) গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় পর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনাগুলোয় এমআরডিআই-এর পক্ষ থেকে একটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। মূল প্রবন্ধে ৭ ধারায় সন্নিবেশিত উপধারাগুলোর সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোনোটি সংবিধানের ৩৯(২) উপানুচ্ছেদে প্রদত্ত বাধানিষেধগুলোর কোনোটির সঙ্গে সম্পর্কিত তা চিহ্নিত করা হয় এবং বিশ্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশ যেমন সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানির তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনে সন্নিবেশিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে কোনগুলো বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় বাধানিষেধ হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে তা উক্ত দেশগুলোর তথ্য অধিকারবিষয়ক আইন পর্যালোচনাপূর্বক চিহ্নিত করা হয়। এরপর নির্ধারিত আলোচকদের আলোচনার পর উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিরা ও অংশগ্রহণকারীরা আলোচনায় অংশ নেন।

উপর্যুক্ত ছয়টি বিভাগীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলো ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়। বিভাগীয় কর্মশালাগুলো ও সেমিনারে প্রাপ্ত সুপারিশগুলোর সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় প্রাপ্ত সুপারিশ ও বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো যুক্ত করে চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়।

সুপারিশমালা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের মূল স্পিরিটকে বিবেচনায় রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৪-এ প্রদত্ত নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার, ধারা ৩-এ প্রদত্ত তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য এবং আইনের প্রস্তাবনায় বিধৃত আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছে।

ধারণা জরিপের পদ্ধতিগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে নানাজন নানা মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুপারিশগুলোর যৌক্তিকতা ও প্রদত্ত সুপারিশে সহমত পোষণকারীর সংখ্যা বিবেচনা করে সুপারিশগুলো গ্রহণ করা হয়।

ধারণা জরিপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ধারা ৭-এর উপধারা (ক)

মূলপাঠ: (ক) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত: এফজিডি, কেআইআই ও গোলটেবিল আলোচনা অনুযায়ী এই উপধারাটি বহাল রেখে

উপধারায় ব্যবহৃত জাতীয় নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব শব্দগুলোর অর্থ স্পষ্ট করার জন্য এগুলোর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সুপারিশ: রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে যুক্ত সকল বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। অতি ক্ষুদ্র একটি ঘটনাও পরিস্থিতি বিবেচনায় জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্নের কারণ হয়ে উঠতে পারে। কোনো ঘটনা বা তথ্য বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি কি না তা প্রতিটি ঘটনার বা তথ্যের গুরুত্ব ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্ধারণযোগ্য। ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায়ও এই উপধারাটি বহাল রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। কাজেই সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ধারা ৭-এর উপধারা (ক) হুবহু বহাল রাখা সমীচীন। তবে উপধারায় ব্যবহৃত জাতীয় নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব শব্দগুলোর অর্থ স্পষ্ট করার জন্য এগুলোর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হলে অস্পষ্টতা দূর হবে।

ধারা ৭-এর উপধারা (খ)

মূলপাঠ: (খ) পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত: উপধারাটি বহাল রাখা প্রয়োজন। তবে দেশ ও জনগণের স্বার্থের অনুকূলে হলে প্রকাশ করা সমীচীন।

সুপারিশ: পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সংযুক্ত সব বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা খুবই দুষ্কর। ক্ষুদ্র একটি ঘটনাও পরিস্থিতি বিবেচনায় দুই দেশের বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংস্থা'র সঙ্গে বিদ্যমান সুসম্পর্ক ক্ষুণ্নের কারণ হয়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট ধারায় দেশ ও জনগণের স্বার্থে প্রয়োজন হলে তা প্রকাশ করার সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই এতৎসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে না থাকলেও বাংলাদেশের সংবিধানে উদ্ধৃত বাধানিষেধ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ধারা ৭-এর উপধারা (খ) হুবহু বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (গ)

মূলপাঠ: (গ) কোনো বিদেশি সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য;

মতামত: এ উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে বিদেশি রাষ্ট্র হতে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য দেশের ও জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় প্রকাশ করা প্রয়োজন হতে পারে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় একজন আলোচক ৭ 'খ' এবং 'গ' দুটোই ফরেন রিলেশনের ব্যাপারে যা সিক্রেট ইনফরমেশন বিধায় দুটোকে একত্রিত করা যেতে পারে মর্মে মন্তব্য করেন। তবে 'বিদেশি সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য' শুধু ফরেন রিলেশন-বিষয়ক নাও হতে পারে। এটি নিরাপত্তা বা অন্য যেকোনো বিষয়সংক্রান্ত হতে পারে। কাজেই এই উপধারাটি পৃথকভাবে বহাল রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

সুপারিশ: দেশ ও জনগণের স্বার্থে প্রয়োজন হলে তা প্রকাশ করার সুযোগ সংশ্লিষ্ট ধারায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই ধারা ৭-এর উপধারা (গ) হুবহু বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ঘ)

মূলপাঠ: (ঘ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

ধারা ৭-এর উপধারা (ণ)

মূলপাঠ: (ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য;

মতামত: উপধারা দুটি বহাল রাখা সমীচীন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায়ও ৭ 'ঘ' এবং 'ণ' উপধারা দুটোকে একত্রিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে কপিরাইট ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সাহিত্য, শিল্পকর্ম, কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক ও শিশু গবেষণালব্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলোকে এই উপধারার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে

> **তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি রোধ করবে দুর্নীতি**

এবং উপধারা (ণ)-এর সঙ্গে একত্রিত করে একটি ক্লাস্টার করা যেতে পারে।

সুপারিশ: ধারা ৭-এর উপধারা (ঘ) ও (ণ) সমন্বয়ে গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা বহাল রাখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে World Intellectual Property Organization গঠনসংক্রান্ত Convention অনুসরণে চিহ্নিত ক্ষেত্র হিসেবে সাহিত্যকর্ম, শিল্পকর্ম এবং কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ উদ্ভাবন বা আবিষ্কার, শিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনী, অভিনয়, ট্রেডমার্ক, সার্ভিস মার্ক, বাণিজ্যিক নাম ও পদবি অন্তর্ভুক্তির যোগ্য। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্মতিক্রমে এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করা যাবে মর্মে শর্ত সন্নিবেশিত করা যায়।

ধারা ৭-এর উপধারা (ঙ)

মূলপাঠ: (ঙ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা:

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তনসংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোনো আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকিসংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;

মতামত: উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে সুদের হার পরিবর্তনের তথ্য আগাম জানা উচিত। তা ছাড়া ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকিসংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য দিলে রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি নেই। কাজেই এ উপধারাটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

সুপারিশ: সুদের হার পরিবর্তনের তথ্য বা ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকিসংক্রান্ত কোনো তথ্য আগাম প্রকাশ করলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অধিকন্তু ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায়ও 'ঙ' ধারাকে যেভাবে রাখা আছে সেভাবে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। কাজেই ধারা ৭-এর উপধারা (ঙ) হুবহু বহাল রাখাই সমীচীন।

ধারা ৭-এর উপধারা (চ)

মূলপাঠ: (চ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত: উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন।

ধারা ৭-এর উপধারা (ছ) এর প্রথম অংশ:

মূলপাঠ: (ছ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

সুপারিশ: এ উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে জনস্বার্থ বিবেচনায় নির্ধারিত হবে এটি প্রকাশ পাবে কি, পাবে না।

মতামত: ধারা ৭-এর উপধারা (ছ)-এর প্রথম অংশ সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃখলাসংক্রান্ত এবং উপধারা (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশ বিচারাধীন মামলাসংক্রান্ত হওয়ায় পৃথক গুচ্ছভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

ধারা ৭-এর উপধারা (ঝ)

মূলপাঠ: (ঝ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত: উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে (চ), (ছ)-এর প্রথম অংশ ও (ঝ) উপধারা একত্রিত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ঞ)

মূলপাঠ: (ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য;

মতামত: উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন।

ধারা ৭-এর উপধারা (ড)

মূলপাঠ: (ড) কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত: উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে (চ), (ছ) উপ-ধারার প্রথম অংশ, (ঝ), ও (ঞ) উপধারাগুলোর সঙ্গে (ড) যুক্ত হয়ে একটি গুচ্ছভুক্ত উপধারা হতে পারে।

সুপারিশ: এই উপধারা ৫টি সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃখলা, অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা বা অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে, এইরূপ তথ্য প্রদানসংক্রান্ত বিধায় বহাল রাখা সমীচীন। কাজেই সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃখলা বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপধারাগুলো তথা (চ), (ছ) উপ-ধারার প্রথম অংশ, (ঝ), ও (ঞ) উপধারাগুলোর সঙ্গে (ড) উপধারাটি গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা গঠন করে বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশ

মূলপাঠ: (ছ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত: এ উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে জনস্বার্থ বিবেচনায় নির্ধারিত হবে এটি প্রকাশ পাবে কি পাবে না।

> **আদিবাসী-পাহাড়ি যে যেখানে থাকে তথ্য জানার সমঅধিকার রাখে**

সুপারিশ: ধারা ৭-এর উপধারা (ছ) এর দ্বিতীয় অংশ সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে বিচারাধীন মামলাসংক্রান্ত হওয়ায় পৃথক গুচ্ছভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কাজেই উপধারা (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশ সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে এতৎসংক্রান্ত উপধারা (ট) সমন্বয়ে গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা তৈরি করে বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ট)

মূলপাঠ: (ট) আদালতে বিচারাধীন কেনো বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

মতামত: উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে ছ-এর দ্বিতীয় অংশ এবং ট একত্রিত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে। আদালত অবমাননার একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করা প্রয়েজন।

সুপারিশ: এই উপধারাটি সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে আদালতে বিচারাধীন বিষয় এবং আদালত অবমাননাসংক্রান্ত বিধায় প্রয়োজনীয় বিবেচনায়

বহাল রাখা সমীচীন। তবে সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে বিচারাধীন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপধারাসমূহে তথা (ছ) উপধারার দ্বিতীয় অংশ ও (ট) উপধারা গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা গঠন করে বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (জ)

মূলপাঠ: (জ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত: এইরূপ তথ্য প্রকাশের ফলে ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হবে বিধায় উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়/ক্ষেত্রগুলো স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এই ধারার এ জায়গাটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা উচিত। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টা সুনির্দিষ্ট করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রবিধি তৈরি করা প্রয়োজন।

ধারা ৭-এর উপধারা (দ)

মূলপাঠ: (দ) কোনো ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

মতামত: এই উপধারাটি ধারা ৩(খ)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাদ দিয়ে (জ) উপধারায় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

সুপারিশ: এই উপধারাটি ধারা ৩(খ) উপধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ উক্ত ৩(খ) উপধারায় প্রচলিত অন্য কোনো আইনের তথ্য প্রদানে বাধাসংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাবে মর্মে বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। ধারা ৭-এর উপধারা (জ) সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে শালীনতা/নৈতিকতা তথা ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা এবং সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় একই ধরনের উপধারা (দ) সমন্বয়ে একটি উপধারা গঠন করে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়গুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আয়কর বিবরণী, সম্পদ বিবরণী এবং ব্যাংক হিসাবসংক্রান্ত বিবরণী নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে (জ) উপধারায় ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে:

শর্তাবলী:

(ক) দাপ্তরিকভাবে ঘোষিত তথ্যাদি যেমন– কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, উপাধী, পদবি, বেতন স্কেল, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কার্যাবলী, দাপ্তরিক ঠিকানা, দাপ্তরিক টেলি/গেলো ফোন নং, ই-মেইল ঠিকানা, ইত্যাদি তথ্য প্রকাশে কোনো বাধা থাকিবে না।

(খ) কোনো ব্যক্তির জাতি, ধর্ম,বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ, ধর্মীয় বা দার্শনিক বিশ্বাস, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ, স্বাস্থ্য ও যৌন জীবনসংক্রান্ত তথ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত তথ্য, পোষাক-পরিচ্ছেদ, ইন্টারনেট ব্যবহার, আয়কর বিবরণী, সম্পদ বিবরণী এবং ব্যাংক হিসাবসংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতিক্রমে প্রকাশ করা যাইবে।

(গ) ব্যক্তিগত তথ্যে প্রবেশাধিকার শুধুমাত্র তখনই দেওয়া যাইবে যখন আবেদনকারীর তথ্য পাওয়ার স্বার্থ তৃতীয় পক্ষের তথ্যে প্রবেশাধিকার না দেওয়ার স্বার্থের চেয়ে উর্ধ্বে স্থান পাইবে অথবা তৃতীয় পক্ষ তথ্য সরবরাহে সম্মতি প্রদান করিবে।

৯. ধারা ৭-এর উপধারা (ঠ)

মূলপাঠ: (ঠ) তদন্তাধীন কোনো বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত: উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই উপধারাটির প্রয়োজন রয়েছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় গোলটেবিল আলোচনায় তদন্তের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তথ্য প্রকাশ না করার বিষয়ে একমত প্রকাশ করে একটু অ্যাডজাস্ট করা দরকার বলে মত দেওয়া হয়। যতোক্ষণ তদন্ত বা পুলিশি ইনভেস্টিগেশন শেষ না হবে অথবা ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংসের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ফাইনালাইজড না হওয়া পর্যন্ত এ তথ্য দেওয়া যাবে না। অন্য একজন আলোচক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পরে প্রকাশ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন।

সুপারিশ: তদন্তাধীন বিষয়-সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই উপধারাটির প্রয়োজন রয়েছে বিধায় এই উপধারাটি আংশিক সংশোধনপূর্বক বহাল রাখা সমীচীন।

ধারা ৭-এর উপধারা (ঢ)

মূলপাঠঃ (ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;

মতামতঃ ধারা ৭-এর উপধারা (ঢ)-তে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এরূপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধান বা আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লিখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তদুপরি এই উপধারাটি ধারা ৩(ক) উপধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ উক্ত ৩(ক) উপধারায় প্রচলিত অন্য কোনো আইনের তথ্য প্রদানসংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলি দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে না মর্মে বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, সার্ভে আইনের বিধান অনুযায়ী সরেজমিনে মাঠ জরিপের পর প্রত্যেক প্লটের জন্য জমির মালিককে জমির মালিকানাসংক্রান্ত মাঠ পরচা সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক। এটি করা না হলে জমির প্রকৃত মালিকের পক্ষে কোনোরূপ ভুল সংশোধনের নিমিত্ত আপত্তি বা আপিল মামলা দায়ের করা সম্ভব হবে না। ফলে জমির মালিকানা নিয়ে সমাজে বড় ধরনের বিশৃখলা দেখা দিতে পারে এবং প্রচুরসংখ্যক দেওয়ানি মামলার সৃষ্টি হতে পারে। প্রচলিত আইনের বাধ্যবাধকতা অবশ্যই পালনীয় এবং এই উপধারাটি ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাদ দেওয়া যেতে পারে।

সুপারিশঃ এই উপধারাটি তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৩(ক) উপধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় এটি বহাল রাখা সমীচীন নয়।

ধারা ৭-এর উপধারা (ত)

মূলপাঠঃ (ত) কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য;

মতামতঃ উপধারা (ত) বহাল রাখা সমীচীন নয়। কারণ সরকারি ক্রয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রকিউরমেন্ট আইন অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আর্মস কেনার তথ্য বা এ ধরনের তথ্য ছাড়া Public Procurement-এর তথ্য গোপনীয় নয়। কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে কোনো তথ্যই দেওয়া যাবে না, এটা মোটেই ঠিক নয়। কারণ এতে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাবে। কাজেই এই উপধারাটি বাদ দেওয়া যেতে পারে। তবে ডিরেক্টর জেনারেল, সিপিটিইউ, মিনিস্ট্রি অব প্ল্যানিং বলেন যে, 'এখানে একটি সুপারিশ সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে, যেটি আমার বিষয়। যেখানে বলা হয়েছে কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।' এই যে কথাটা বলা হয়েছে এটা কমপ্লিমেন্টারি টু দ্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট। সেখানে বলা হয়েছে, 'ক্রয়কারী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কোনো ব্যক্তির নিকট যাচিত স্পষ্টীকরণের ক্ষেত্র ব্যতিত দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্ত বা খোলা হইতে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা রক্ষা করিবে।' সুতরাং এখানে যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি রিলেট করে শুধু ইভাল্যুয়েশন থেকে অ্যাপ্রুভাল। ইভাল্যুয়েশন এবং অ্যাপ্রুভাল পর্যন্ত তথ্য গোপন রাখতে হবে, ইট ইজ প্রভিশন অব দ্য অ্যাক্ট। আর এখানে তথ্য অধিকার আইনে যেভাবে বলা হয়েছে এটি আসলে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোনো 'ক্রয়' এটি আসলে 'গণক্রয়' হবে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে' হবে না এটি হবে 'মূল্যায়ন পর্ব হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত'। এখানে কিন্তু পুরোটাকেই বেঁধে ফেলা হয়েছে। আসলে এটি হবে মূল্যায়ন পর্ব পর্যন্ত। এটা যেন বাদ দেওয়া না হয়। কিন্তু এটাকে রিফাইন করতে হবে, যাতে এটা অ্যাক্টের কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে পারফেক্ট হয়।

সুপারিশঃ ধারা ৭-এর উপধারা (ত)-তে উল্লিখিত 'কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রমসংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়' মর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ বা আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লিখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তদুপরি এই উপধারাটি ধারা ৩(ক) উপধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ উক্ত ৩(ক) উপধারায় প্রচলিত অন্য কোনো আইনের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলি এই

আইনের বিধানাবলি দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে না মর্মে বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সরকারি ক্রয় কার্যক্রম পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সম্পাদিত হয় এবং উক্ত আইন ও বিধিমালায় বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তা ছাড়া ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার তাারিখ ও উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ এক নয় এবং এদের মধ্যে সময়ের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ফলে 'কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রমসংক্রান্ত' কোনো তথ্য প্রকাশ না করার সুযোগ দুর্নীতিকে উৎসাহিত করবে, যা তথ্য অধিকার আইনের প্রস্তাবনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য পরিপন্থী। কাজেই প্রচলিত আইনের বাধ্যবাধকতা অবশ্যই পালনীয় হওয়ায় এবং এই উপধারাটি ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় উপধারা ৭ (ত) বাদ দেওয়া প্রয়োজন। তবে ডিরেক্টর জেনারেল, সিপিটিইউ-এর মতামত বিবেচনা করে এই উপধারাটি আংশিক সংশোধনপূর্বক নিম্নোক্তভাবে বহাল রাখা যেতে পারে:

"গণখাতের কোনো ক্রয় কার্যক্রমে বা অন্য কোনো ক্রয় কার্যক্রমের দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলনসহ দরপত্র উন্মুক্ত বা খোলা হইতে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত কোনো তথ্য;

ধারা ৭-এর উপধারা (থ)

মূলপাঠ: (থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হতে পারে এই তথ্য;

মতামত: জাতীয় সংসদের মর্যাদা হানি হবে, এটা নিয়ে দ্বিধা আছে। এ বিষয়ে আরো বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। জাতীয় সংসদের যাঁরা জনপ্রতিনিধি তাঁরা জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় চলছেন। জাতীয় সংসদ সম্পর্কে কোনো কিছুই জানা যাবে না, তাতে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে, এটি একটি দুর্বল যুক্তি। সংসদের বিশেষ অধিকার বলে যদি কারো অধিকার হানি হয়, কারো সম্মানহানি হয় সেই ক্ষেত্রে তিনি কোনো রিমেডি পাবেন কি না আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে সেই বিষয়টিও আলোচনা করা দরকার। কাজেই এ উপধারাটির ব্যাখ্যা দরকার আছে। সংসদের অধিকার বলতে কী বোঝায়? কীভাবে তা ক্ষুণ্ন হতে পারে? মানহানি তো একেকজনের কাছে একেক রকম। এগুলোর ব্যাখ্যা দরকার।

সুপারিশ: বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির বিষয়টি সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। অধিকন্তু জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার বলতে কী বুঝায় এবং কীভাবে তা ক্ষুণ্ন হতে পারে, সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। তবে যুক্তরাজ্য, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার তথ্য অধিকারবিষয়ক আইনে জাতীয় সংসদের, বিশেষ অধিকার হানির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমতাবস্থায়, এই উপধারাটি বহাল রাখা যেতে পারে। তবে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ধ)

মূলপাঠ: (ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

মতামত: উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন।

সুপারিশ: বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় এ উপধারাটি বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ন)

মূলপাঠ: (ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোনো তথ্য:

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

মতামত: উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। মন্ত্রিপরিষদ জনস্বার্থে কাজ করে। কী কাজ করবে, কী সিদ্ধান্ত নেবে তা জনগণের জানার অধিকার আছে। জনস্বার্থের প্রয়োজনে যা গোপন থাকা উচিত তা পূর্বোক্ত উপধারাগুলো দ্বারা সুরক্ষিত। উপধারা (ন)-

তথ্য গোপন, ভুল তথ্য ক্ষুণ্ন করে দেশের স্বার্থ

রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে যদি তথ্য গোপন করা হয়
তবে তা সরকারের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনে না

এর শেষে অতিরিক্ত শর্তটিতে 'ধারা' শব্দটি 'উপধারা' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা দরকার।

সুপারিশঃ উপধারাটি শুরু হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপনীয় সারসংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসংক্রান্ত বিষয়াদির তথ্য প্রকাশ নিয়ে। কাজেই এই উপধারাটির শর্ত ও অতিরিক্ত শর্তটিও মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপনীয় বিষয়াদির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু অতিরিক্ত শর্তটিতে 'এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে' মর্মে উল্লেখ করায় বিষয়টি শুধু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত না থেকে সকল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং এই সুযোগে অন্য কতিপয় কর্তৃপক্ষও তথ্য প্রদান স্থগিত রেখে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করেছে, যা সমীচীন নয়। তা ছাড়া সংবিধানে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের সুযোগ না থাকায় 'বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ' শব্দগুলো (২ বার) বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

সুপারিশগুলো সমন্বিত করে সারণি-৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সুপারিশের সারসংক্ষেপ

(ক) বহাল রাখার প্রস্তাব

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন এবং সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো আইন প্রণয়ন করা হলে তা বাতিলযোগ্য বিধায় তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় প্রদত্ত ২০টি উপধারার মধ্যে (ক), (খ) এবং (গ) সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় হুবহু এবং (চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (ঝ), (ঞ) এবং (ড) উপধারাগুলো সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।

২. সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত (ছ) উপধারার দ্বিতীয় অংশ এবং আদালত অবমাননা সংক্রান্ত (ট) উপধারা গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।

৩. সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে শালীনতা বা নৈতিকতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্পর্কিত

গৃহশ্রমিকের অধিকারঃ

আপনার বাড়িতে যে শিশুটি কাজ করছে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, নিরাপত্তা ও বিনোদন নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনার। সেইসাথে তাকে নির্যাতন করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। ভাল ব্যবহার পাওয়ার অধিকার আছে প্রতিটি গৃহশ্রমিকের।

উপধারা (জ) এবং (দ) একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে এবং ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

৪. সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে নৈতিকতা ও জনশৃখলার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় (ধ) উপধারাটি হুবহু বহাল রাখা যেতে পারে।

৫. বিশ্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশ, যেমন– সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানির তথ্য অধিকারবিষয়ক আইনে সন্নিবেশিত বাধানিষেধগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্নোক্ত উপধারাগুলো বহাল রাখা যেতে পারে:

- Intellectual Property Rights-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপধারা (ঘ) ও (ণ) সমন্বয়ে গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা বহাল রাখা যেতে পারে।

- ধারা ৭-এর (ঙ) উপধারাটি জনস্বার্থ ও সামষ্টিক অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধায় কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য হুবহু বহাল রাখা যেতে পারে।

- ধারা ৭-এর উপধারা (থ)-তে উল্লিখিত জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এইরূপ তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সাংবিধানিক বাধানিষেধ না থাকলেও যুক্তরাজ্য, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার তথ্য অধিকার আইনে সন্নিবেশিত রয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় এটি বহাল রাখা যেতে পারে। তবে বিশেষ অধিকারহানির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

(খ) সংশোধনের প্রস্তাব

১. ধারা ৭-এর উপধারা (ঠ)-তে উল্লিখিত তদন্তকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি তদন্তকালে বা তদন্ত সমাপ্তির পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয় মর্মে (ঠ) উপধারা সংশোধন করা যেতে পারে।

২. ধারা ৭-এর উপধারা (ত)-তে উল্লিখিত সরকারের যেকোনো ক্রয় কার্যক্রম Public Procurement Act, Rules এবং Regulations অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন

সারণি-৩

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মূলপাঠ	সংখ্যা/প্রস্তাব	সুপারিশকৃত
(ক) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	১ হুবহু বহাল	(১) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	২ হুবহু বহাল	(২) পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
(গ) কোনো বিদেশি সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য; (ঘ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য; (ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য;	৩ হুবহু বহাল ৪ গুচ্ছবদ্ধ করে বহাল	(৩) কোনো বিদেশি সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য; (৪) (ক) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য এবং (খ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য;
(ঙ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা: (অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য; (আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোনো আগাম তথ্য; (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;	৫ হুবহু বহাল প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের	(৫) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা ঃ (ক) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য; (খ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোনো আগাম তথ্য; (গ) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মূলপাঠ	সংখ্যা/প্রস্তাব	সুপারিশকৃত
(চ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বাঅপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ছ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ঝ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য; (ড) কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;	৬ গুচ্ছবদ্ধ করে বহাল	(৬) (ক) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য; (খ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (গ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ঘ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য; এবং (ঙ) কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;
(ছ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচারকার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ট) আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;	৭ সমন্বিত করে বহাল	(৭) (ক) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচারকার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (খ) আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;
(জ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (দ) কোনো ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;	৮ গুচ্ছবদ্ধ করে বহাল	(৮) (ক) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য (খ) কোনো ব্যক্তির আর্থিক লেনদেন, আয়কর ও সম্পদ বিবরণী সম্পর্কিত ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য;
(ঠ) তদন্তাধীন কোনো বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;	৯ (সংশোধিত)	(৯) তদন্তাধীন কোনো বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;
(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;	বাদ-	-

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মূলপাঠ	সংখ্যা/প্রস্তাব	সুপারিশকৃত
(ত) কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য;	১০ (সংশো-ধিত)	(১০) গণখাতের কোনো ক্রয় কার্যক্রমে বা অন্য কোনো ক্রয় কার্যক্রমের দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলনসহ দরপত্র উন্মুক্ত বা খোলা হইতে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত কোনো তথ্য;
(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	১১ হুবহু বহাল	(১১) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;	১২ হুবহু বহাল	(১২) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোনো তথ্য: তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে: আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।	১৩ (সংশো-ধিত)	(১৩) মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোনো তথ্য: তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা হইবে: তবে আরো শর্ত থাকে যে, এই উপধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

তথ্য প্রকাশের বিধান থাকায় সেগুলো গোপন রাখার প্রবণতা যাতে দেখা না দেয়, সেজন্য এই উপধারাটি সংশোধন করা যেতে পারে।

৩. ধারা ৭-এর (ন) উপধারাটিতে উল্লিখিত মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপনীয় সারসংক্ষেপসহ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সিদ্ধান্তের কারণসহ গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রকাশের বিধান রয়েছে। উপধারাটি শুধু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবেচনায় অতিরিক্ত শর্তটি সংশোধন করা যেতে পারে।

(গ) বাতিলের প্রস্তাব

১. ধারা ৭-এর উপধারা (ঢ)-তে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধান বা আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লিখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তদুপরি এই উপধারাটি ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাদ দেওয়া যেতে পারে।

রাষ্ট্রকে জনগণের জন্য প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত

সামর্থ্যহীনদের জন্য আইনগত সহায়তা তহবিলঃ

আইনের আশ্রয় নেয়ার মতো যাদের আর্থিক সামর্থ্য নেই, এমন নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আইনি সহায়তা দিতে জেলা ও দায়রা জজের তত্ত্বাবধানে এই তহবিল থেকে বরাদ্দ দেয়া হয়। এর পাশাপাশি বৃদ্ধ, পাচারের শিকার নারী ও শিশু, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত ও স্বামী পরিত্যক্তা নারী, প্রতিবন্ধী, এসিডদগ্ধ মানুষ আইনগত সহায়তা তহবিল থেকে সহায়তা পেতে পারেন।

করার জন্যই তথ্য অধিকার আইন। আবার জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থেই কিছু তথ্য প্রকাশের ওপর বিধিনিষেধও জরুরি। আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা, সর্বোপরি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে কিছু তথ্য গোপন থাকবে এটাও স্বাভাবিক। বিগত পাঁচ বছরে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর প্রয়োগ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এই ধারা অপব্যবহার করে তথ্য বঞ্চিত করার যে চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে তা দূর করতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচনায় অত্র ধারণা জরিপ পরিচালিত হয়েছে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে প্রকাশ যোগ্য নয় বলে যেসব তথ্যের উল্লেখ রয়েছে তা অধিকাংশই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তথাপি বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় কিছু তথ্য রয়েছে যেগুলো গোপন থাকা বাঞ্ছনীয় নয় এবং কিছু তথ্যের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। তদনুযায়ী ১০টি উপধারা সমজাতীয় বিধায় সহজবোধ্য করণর্থে গুচ্ছবদ্ধ করার, ৩টি উপধারা প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করার এবং একটি উপধারা তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ছয়টি উপধারা হুবহু বহাল রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, সুপারিশ অনুযায়ী এই ধারাটি সংশোধন করা হলে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই সুবিধাজনক হবে এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ধারাবাহিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তথ্য অধিকার আইন তার অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে।

(এমআরডিআই থেকে সংগৃহীত)

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

নেপাল চন্দ্র সরকার
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে। এই আইনে নাগতরিকদের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকের অনুরোধকৃত তথ্য প্রদানে সব কর্তৃপক্ষের ওপর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনে বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সব সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ ও সংবিধান অনুযায়ী গঠিত সংস্থাসহ সরকারি সাহায্যপুষ্ট ও বিদেশি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থাগুলোর ওপর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি এই আইনকে তথ্য প্রদানে বাধাসংক্রান্ত অন্য সব আইনের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে এবং আইনের প্রস্তাবনায় এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয় তথ্য অধিকার আইনের মূল ভাবকে আমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

একটি আবেদন পাওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দেবেন কি না, তা জানার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে মতামত বা অনুমতি চাওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আবার তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে দিকনির্দেশনা চান। এভাবে উপজেলা পর্যায় থেকে ধাপে ধাপে ঢাকার প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত মতামত, অনুমতি বা দিকনির্দেশনা চাওয়ার নজিরও তৈরি হয়েছে। শুধু তথ্য দেয়া হবে কি হবে না, সেই সিদ্ধান্ত নিতেই এমন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তথ্যটি হয়তো কৃষি/মৎস্য/স্বাস্থ্য/উন্নয়নে বা সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভীতি ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এমনটি হচ্ছে। তিনি হয়তো ভাবেন- তথ্য দিয়ে তিনি আবার কোনো বিপদে পড়েন কি না। দাফতরিক ক্ষেত্রে 'দাফতরিক গোপনীতা আইন' এবং সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালার চর্চাও এর কারণ হিসেসে কাজ করছে। দীর্ঘদিন চলে আসা গোপনীয়তার সংস্কৃতি ও তথ্য প্রদান থেকে উদ্ভূত সমস্যা ও শাস্তির ভীতি থাকায় নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো কোনো সময় তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না কওে আবেদনকারীকে মৌখিকভাবে তথ্য দিচ্ছেন, যা তথ্য অধিকার আইনের আওতাবহির্ভূত। এতে প্রদত্ত তথ্য বিকৃত করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং অন্যদিকে তথ্যেও মূল্য বাবদ আদায়যোগ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়।

তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভীতির দুটি দিক পরিলক্ষিত হয়েছে- এক দিকে দাফতরিক গোপনীয়তা আইনসহ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯-এর বিধি নম্বর ১৯ এবং তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৪ ও ২৭।

সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯-এর ১৯ নম্বর বিধিতে বলা হয়েছে:

'Communication of official documents or information: A Government servant shall not, unless generally or specially empowered, by the Government in this behalf, disclose directly or indirectly to Government servants of other Ministries,

Divisions or Departments, or to non-officials persons or to the press, the contents of any official document or communicate any information which has come into his possession in the course of his duties, whether from official sources or otherwise.'

অন্যদিকে তথ্য অধিকার আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে, '৪। তথ্য অধিকার। এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং একজন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।'

অধিকন্তু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ২৭ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির সূত্রে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-

(ক) কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ বা আপিল গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে; বা (খ) এ আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করতে কিংবা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে ব্যর্থ হলে; বা (গ) অসদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে; বা (ঘ) যে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করা হয়েছে তা প্রদান না করে ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করলে; বা (ঙ) কোনো তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তথ্য কমিশন, দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্তরূপ কার্যের তারিখ হতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা আরোপ করতে পারবে, এবং

তথ্য কমিশন যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে উক্তরূপ কোনো কার্য করে কোনো কর্মকর্তা ভিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তথ্য কমিশন উল্লিখিত জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এহেন কার্যকে অসদাচরণ গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপাশি করতে পারবে এবং এ বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করবার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে পারবে। উল্লেখ্য, এ ধারার অধীন পরিশোধযোগ্য কোনো জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX O 1913)-এর বিধান অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

আবেদিত তথ্য প্রদান করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্মে ২০টি উপধারা সংযোজিত হয়েছে। সেখানে দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার; জনশৃংখলা; জনগণের নিরাপত্তা; ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা; বিচারাধীন বিষয়াদি ও আদালতের নিষেধাজ্ঞা; আদালত অবমাননা; তদন্তাধীন বিষয়াদি; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানি; মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় কতিপয় তথ্য প্রদান বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই উপধারাগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছে। আবেদন পাওয়ার পর চাহিত তথ্যটি কি প্রদানযোগ্য, নাকি ধারা ৭ অনুসারে 'প্রদান বাধ্যতামূলক নয়' এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার জন্য কঠিন হচ্ছে। কারণ তার হাতে তথ্য অধিকার আইন থাকলেও এমন কোনো নিজস্ব দাফতরিক নির্দেশনা নেই, যা তাকে আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

এই ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা বা নির্দেশিকা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য সহায়ক হতে পারে। এসব পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণলয় কর্তৃক প্রকাশিত সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর ২৬৩ নম্বর নির্দেশে নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিকরণার্থে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসরণপূর্বক প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদফতর, সংস্থা ও এর আওতাভুক্ত অফিসগুলো স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে এবং নাগরিকগণের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।' মর্মে নির্দেশনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা যেহেতু ইউনিটের নিজস্ব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও জারিকৃত হবে, সেহেতু এটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিশ্চিত করবে

এবং এটির অনুসরণ তার জন্য অনেক স্বস্তিদায়ক হবে। তথ্য প্রদানের জন্য যেমন তাকে কারো অনুমতি বা অনুমোদন নিতে হবে না, তেমনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হবে না। ফলে তার তথ্য প্রদানের ভীতি ও অনীহা দূর হবে বলে আশা করা যায়। তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকাগুলোতে আপিল কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ের দিকনির্দেশনা থাকবে, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের করণীয় নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা কী

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা হলো তথ্য আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালাগুলোর আলোকে প্রণীত কোনো কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ নীতিমালা বা নির্দেশিকা বা পরিপত্র, যা অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/অফিস তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে জনগণের কাছে তথ্য সরবরাহ/ উন্মুক্ত করতে পারে। এই নীতিমালায় আবেদনের ভিত্তিতে তথ্য প্রদান, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ অন্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধান সন্নিবেশিত থাকবে, যা অধীনস্থ সব দফতরের জন্য পথনির্দেশ হিসেবে কাজ করবে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা কেন প্রয়োজন

প্রশ্ন উঠতে পারে, তথ্য অধিকার আইন/বিধি/ প্রবিধিতেই তো এ - সংক্রান্ত সব বিধিবিধান রয়েছে। তাহলে আবার তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/ নির্দেশিকার প্রয়োজন কেন?

- তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভীতি, দিকনির্দেশনার অভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, প্রজন্মপরম্পরা-বাহিত দাফতরিক গোপনীয়তার মানসিকতা ও এর চর্চা ইত্যাদি কারণে তথ্য প্রদান না করার যেসব ঘটনা ঘটেছে তা দূর হবে।
- তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা ইউনিটের নিজস্ব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও জারিকৃত হওয়ার কারণে এটি তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিশ্চিন্ত করবে এবং এটির অনুসরণ তার জন্য অনেক স্বস্তিদায়ক হবে। তথ্য প্রদানের জন্য যেমন তাকে কারো অনুমতি বা অনুমোদন নিতে হবে না, তেমনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হবে না। ফলে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তার ভীতি ও অনীহা দূর হবে।
- তথ্যেও শ্রেণি বিভাগ করে কর্তৃপক্ষ কোন কোন তথ্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন মাধ্যমে প্রকাশ করবে, কোন ত্যথ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদান করবে, ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে কোন তথ্যগুলো প্রদান করবে না. ইত্যাদি এই নীতিমাল/নির্দেশিকায় তার তালিকা সুনির্দিষ্ট করা হবে বিধায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন সহজতর হবে।
- তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকায় কর্তৃপক্ষের ধরন ও কার্যক্রমের ভিন্নতা এবং তথ্যগুলোর চরিত্রগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিয়ে তথ্য অধিকার আইন ও এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা/প্রবিধানমালার আলোকে তথ্য প্রদান ও প্রকাশসংক্রান্ত বিধানসমূহ সুনির্দিষ্ট করা সহজ হবে।
- দাফতরিক গোপনীয়তা আইনসহ অনুসূপ অন্যান্য আইন বা বিধিমালার বিধান অনুসরণে তথ্য গোপন করার প্রচলিত চর্চা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃকক প্রণীত ও অনুমোদিত হওয়ায় এই নীতিমালা/নির্দেশিকার বিধানগুলো অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য সহজতর হবে।
- নীতিমালা/নির্দেশিকায় আপিল কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়েও দিকনির্দেশনা থাকায়, তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের করণীয় নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।
- নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন ও অনুসরণের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তার অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিকে সুদৃঢ় করতে পারবে, যা কর্তৃপক্ষ ও নাগরিক উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক।
- একটি কার্যকর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/

নির্দেশিকা প্রণয়ন ও এর অনুসরণ যথঅযথ নাগরিক সেবা প্রদানে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার পরিচায়ক। এটি কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্যে নাগরিকের সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করে।

তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে, জনগণ সেটিকে ব্যবহার করছে। আমাদের বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরো উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন খুবই জনপ্রিয় হবে। এজন্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা, প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের পক্ষে সদিচ্ছার প্রমাণ রাখা এবং অন্যের জন্য অনুসরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করা। পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর ২৬৩ নম্বর নির্দেশ অনুসরণপূর্বক নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণার্থে প্রতিটিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থাগুলো কর্তৃক তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করে জারি করা হলে এর আওতাভুক্ত অফিসগুলো তা অনুসরণ করে নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে মর্মে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। ■

মোহাম্মদ ফারুক

প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন কিন্তু এই আইন; জনগণ এখনো বুঝতে পারছে না। জনগণ যখন আইনটি বুঝবে তখন তারা এটা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করবে।

দেশে যতো আইন আছে তার সবই জনগণের ওপর প্রয়োগের জন্য। কর্তৃপক্ষ জনগণের ওপর প্রয়োগ করে। তথ্য অধিকার আইন একমাত্র আইন যা জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করতে পারে।

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা

সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন প্রণয়নের চেয়ে আইনের বাস্তবায়ন অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। তথ্য অধিকার আইন এমন একটি আইন, যার বাস্তবায়ন আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং এবং আরো বেশি সুদূরপ্রসারী হবে। কারণ আমাদের প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনেক বেশি পুরোনো। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন নতুন একটি আইন। নতুন কিছুর বাস্তবায়ন সব সময়ই চ্যালেঞ্জিং।

এই আইনটি করা হয়েছে নাগরিকদের জন্য, কিন্তু সেই নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব আছে। অধিকারটি কীভাবে প্রয়োগ করা যাবে তা তাঁরা জানেন না যে তাঁরা তথ্য চাইতে পারেন, পেতে পারেন।

'ক্লাসিফাইড তথ্য আমরা দেবো না। কিন্তু সরকারের সব তথ্যের মধ্যে ক্লাসিফাইড তথ্য খুবই নগণ্য। আমার মতে, ১ শতাংশেরও অনেক কম। সুতরাং এটি নাগরিককে খুব একটা প্রভাবিত করার কথা নয়।

আবুল কালাম আজাদ
মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

একটি গণতান্ত্রিক সরকারের নির্দেশনায় তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে সরকারের চরম রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা আছে। এটার বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি।

আমাদের দেশের এনজিও যে বিদেশি টাকা আনছে, ওটিও জনগণের টাকা। সরকারি টাকার মতো ওই টাকার ব্যয়ের হিসাবও সাধারণ মানুষের জানার অধিকার আছে। আমি অনুরোধ করবো, যেভাবে আমরা সরকারি দফতরের তথ্য নিয়ে কথা বলছি, একইভাবে সমগুরুত্ব দিয়ে আমাদের বেসরকারি সংস্থার তথ্য প্রকাশ নিয়ে কথা বলতে হবে।

নেপাল চন্দ্র সরকার
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা মনে করেন– তথ্যটা যদি আমি দিয়ে দিই, তাহলে আমার কোনো অসুবিধা হয় কি না বা কোনো বিপদে পড়ি কি না। তাই আমরা চিন্তা করেছি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত একটা গাইডলাইন জারি হলে সেই গাইডলাইন অনুসরণ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন অনেক সহজ হবে।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি যারা উপস্থিত আছেন, তাদের আমি অনুরোধ জানাব তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করবেন এবং এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে যাবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে আমরা একটা Exercise করেছিলাম। অংশগ্রহণকারীদের বলেছিলাম, আপনারা আপনাদের অফিসের স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য একটা করে তথ্যের নাম বলেন। ২৫ জনের প্রত্যেকই একটি করে খুব দ্রুত বলে ফেললেন। এরপর যখন বললাম একটি করে বিষয় বলেন যেটি আপনি প্রকাশ করবেন না। তখন সবাই মিলে এক-দুইটার বেশি বলতে পারেনি। এটা প্রমাণ করে, প্রায় সব তথ্য আমাদের দিয়ে দেবার কথা।

এই নীতিমালা আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। তথ্য দেয়া আমাদের কোনো সমস্যা নয়। তথ্য আমাদের কাছে গোছানো অবস্থায় নেই এটাই মূল সমস্যা। তথ্য গুছিয়ে রাখার জন্য, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে এই নীতিমালা আমাদের খুব সহযোগিতা করবে।

মঞ্জুর হাসান, ওবিই
নির্বাহী পরিচালক
সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড লিগ্যাল অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস স্টাডিজ

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা না বলে আমি এটার একটা নাম দিতে চাই। আমি এটাকে বলতে চাই ট্রান্সপারেন্সি চার্টার। এই নীতিমালার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দফতরগুলো নাগরিকের কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, আমরা এই ট্রান্সপারেন্সি চার্টারের আন্দোলন আজ এখান থেকে শুরু হলো।

সহজে ব্যবহারযোগ্য পন্থায় তথ্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ যাতে হয়, এটা যেন খুব সহজ পন্থায় তথ্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ যাতে হয়, এটা যেন খুব সহজ পন্থায় সময়মতো পাওয়া যায়, তথ্য না পেলে মানুষ যেন আপিল অভিযোগ করতে পারে, তথ্য যেন গোছানো অবস্থায় থাকে- এসব কিছুর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারে এই তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা।

শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব ও সময় চলে আসে। এটা উভয়পক্ষকে মেনে নিতে হয়। আমরা আমাদের অধিকার চাইবো, অপর পক্ষে আমাদের কী কর্তব্য আছে তা বুঝবো না, সেটা হয় না।

সরকার ও বেসরকারি সংগঠন আমরা সবাই চাইছি দেশে তথ্যের অবাধ প্রবাহ; চাইছি সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমরা টেবিলের দু'পাশে বসে আছি। আমরা টেবিলের এক পাশেই আছি এবং মিলেমিশে কাজ করছি।

অধ্যাপক ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সরকার এবং সরকারের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে সম্পর্কিত সব প্রশাসনকে গণমুখী করে তোলার জন্য অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন। প্রশাসনের অন্দরে প্রত্যেকটি কুঠুরিতে জনগণ যাতে প্রবেশ করতে পারে, সেজন্য জনগণের হাতে এই আইনটি চাবিস্বরূপ। এটি দুয়ার খোলার আইন।

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সুরক্ষার জন্য একটি মজবুত ভিত্তি প্রয়োজন। উন্নয়ন পরিকল্পনা শুধু গ্রহণ নয়, শুধু পদক্ষেপ নয়, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার জন্য উন্নত প্রশাসন আবশ্যক। তথ্য অধিকার আইন হয়েছে একটি উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য।

হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

তথ্যের আবেদন পাওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। তাই তথ্য প্রদানে তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অপেক্ষা করেন। তথ্য প্রদানসংক্রান্ত ভীতি ও দিকনির্দেশনার অভাব, দাফতরিক প্রজন্মবাহিত এবং চিরাচরিত গোপনীয়তা সংস্কৃতির কারণে এমন ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথাযথ দিকনির্দেশনা পান না, যা তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বেকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা নিজস্ব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত হওয়ায় তা অনুসরণ করা এবং সেই অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তকর্তার জন্য সহজ ও স্বস্তিদায়ক হয়।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা সরকারি কর্তকর্তাদের দাফতরিক গোপনীয়তা আইনের দীর্ঘ চর্চাজনিত মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করবে।

গৃহে এবং গৃহের বাইরে স্বামী আর স্ত্রী যদি একসাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করে এবং দুজন যদি দুজনের কাজে সাহায্য করে, তবে একটি সুখী ও সুন্দর পরিবার গড়ে ওঠে। সংসারের কাজে স্ত্রীকে, মাকে সাহায্য করার মধ্যে কোনো লজ্জা নেই, বরং এতে পুরুষ সম্মানিত হয়। আমরা চাই প্রতিটি পরিবার হোক জেন্ডার সমতাভিত্তিক।

তথ্য অধিকার আইন:

জনগণের আইন শক্তিশালী আইন

ফরিদ হোসেন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইনফোকাস
এবং প্রতিনিধি, টাইম ম্যাগাজিন, যুক্তরাষ্ট্র

যশোরের চৌগাছা দু'টি ঐতিহাসিক কারণে বিখ্যাত। কপোতাক্ষ নদের এই কৃষি অঞ্চল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে নীল বিদ্রোহের সূতিকাগার। আর ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের প্রবেশদ্বার বলেও পরিচিত। নয় মাস ধরে চলা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর বিজয়লাভের কয়েক সপ্তাহ আগেই ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রথম ভূখণ্ড হিসেবে শত্রুমুক্ত হয় এই চৌগাছা।

এরপর ৪০ বছরেরও বেশি সময় পরের কথা। দেশের প্রথম উপজেলা হিসেবে চৌগাছায় তথ্য অধিকার আইন নিয়ে একটি ক্যাম্প করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। যে আইনের মাধ্যমে জনগণ সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং সরকার ও দাতাদের দেশি ও বিদেশি তহবিল থেকে পাওয়া তহবিল ও যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নিজের প্রয়োজনমতো তথ্য পাওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

বিজিএমইএ ভবনের অবৈধতা প্রমাণ করলো তথ্য অধিকার আইন

আইন লংঘন করে নির্মিত বিজিএমইএ ভবনের 'বৈধতা' নিয়ে করা মামলায় তথ্য অধিকার আইনের সুবাদে পাওয়া তথ্যপ্রমাণ ব্যবহৃত হয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্য দিতে রাজউক-এর কাছে আবেদন করা হলে প্রথমে তারা কোনো সাড়া দেয়নি।

কয়েকবার চেষ্টার পরও কাজ না হলে তথ্য কমিশন আইনি নোটিশ পাঠালে রাজউক তথ্য দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তী সময়ে রাজউক-এর সরবরাহ করা নথিপত্রের ভিত্তিতেই আদালত গুরুত্বপূর্ণ এ মামলাটিতে একটি দৃষ্টান্তমূলক রায় দিয়েছে-

২০০৮ সালের ৮ জুলাই, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) আওতায় রাজধানীর ভূমির দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর কাছে কয়েকটি বিষয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করে। যেসব বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে, বিজিএমএই ভবনের প্ল্যানের অনুমোদন ছিল কি না, সরকারি জলাশয়ে ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার পেছনে যুক্তি কী ছিল এবং এর পুরো প্রক্রিয়া। আরটিআই আইন অনুযায়ী বেলা, ২০ কর্মদিবস অপেক্ষা করে। কিন্তু এতে কোনো কাজ হয়নি।

২০০৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর, বেলা, রাজউকের কাছে দ্বিতীয়বারের মতো তথ্য চেয়ে আবেদন করে। এবার

তথ্য চাইলে দিতে হবে, আইন বলেছে তাই
অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাবার, কোন সুযোগ এখন যে আর নাই

একটি বাড়তি তথ্য চাওয়া হয়। সেটি হচ্ছে রাজউক কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) নিয়োগ করেছে কি না। এবারেও তারা আবেদনের কোনো উত্তর পেলো না। এরপর রাজউক-এর আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিবের কাছে আপিল করা হয়। বেলা ভেবেছিল এবার গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব রাজউকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ডিও) আরটিআই আইনের ২৪(৩) ধারা অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহের আদেশ দেবেন। কিন্তু বেলা সেই আপিলেরও কোনো জবাব পেলো না। এরপর বেলা তথ্য কমিশনে অভিযোগ জানায়। অভিযোগ পেয়ে তথ্য কমিশন রাজউককে তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী এবং আপিল কর্তৃপক্ষের নাম জানানোর নির্দেশ দেয়। এছাড়া তথ্য কমিশন রাজউককে ওই অভিযোগের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা সাত দিনের মধ্যে জানাতে নির্দেশ দেয়। বলা হয়, অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। রাজউক যথারীতি নীরব থেকে কমিশনের নির্দেশ অমান্য করে।

২০১০ সালের ২২ জুলাই রাজউকের চেয়ারম্যানের কাছে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়। অবশেষে বেলাকে ১৯ সেপ্টেম্বর কাঙ্ক্ষিত তথ্য দেয় রাজউক। ওই তথ্যে স্পষ্টতই দেখা যায়, অনুমোদনের সঙ্গে বেঁধে দেয়া শর্ত আদৌ মানা হয়নি। ২০১০ সালের ২ অক্টোবর একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়, রাজউকের অনুমতি ছাড়াই বিজিএমইএ ভবন নির্মিত হয়েছে। খবরটি সরকারসহ সব মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। বিষয়টি ক্রমে আন্দোলনে রূপ নেয়।

বেলা'র আইনজীবীরা তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সংগৃহীত নথিপত্র আদালতে পেশ করেন। বেলার প্রধান নির্বাহী রিজওয়ানা হাসান এক শুনানিতে বলেন, এটি (ভবনটির নির্মাণ) পরিবেশগত কনভেনশনসহ কিছু আইন ভঙ্গ করেছে। ঢাকার হাতিরঝিল এলাকায়

ক্যাম্পের লক্ষ্য ছিল জনগণকে জানানো যে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর ব্যবহার করতে পারলে জনগণের কাছে কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতার মাধ্যমে সমাজের সব স্তরে গণতন্ত্রের চর্চা শক্তিশালী হবে। কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ হবে যা দুর্নীতি কমিয়ে আনবে। এই আইন এমন একটি হাতিয়ার, যা ব্যবহার করে নাগরিকেরা তাদের জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে এমন সরকারি সংস্থা ও এনজিওগুলোর কাছ থেকে তথ্য পেতে পারেন। সরকারি সংস্থা ও এনজিওগুলোর কাছ থেকে নাগরিকদের নানা তথ্য জানার আছে। তারা জানতে পারেন সরকারি হাসপাতালগুলোর চিকিৎসকেরা কেন নিয়মিতভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না? কেন একজন অসহায় বিধবা নারী প্রাপ্য সুরক্ষা সুবিধা পান না? তিনি কী সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্কের আওতায় আসতে পারতেন? যারা সরকারি তহবিল পায় এমন স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রক্রিয়া কী? কেন সড়ক নির্মাণের কয়েক মাস পরই তা ভেঙে গেলো? কিংবা উপজেলায় অর্পিত সম্পত্তির তালিকা কোথায় মিলবে? এগুলো বাস্তব ও যৌক্তিক প্রশ্ন, এর উত্তরও খুব সোজা। কিন্তু উত্তর সব সময় পাওয়া যায় না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এসব তথ্য জনগণের কাছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভীতির মধ্যে থাকেন। নয়তো দুর্নীতি বা অনিয়ম গোপন করতে তথ্য দেওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যান। কেউ কেউ খুব স্বাভাবিকভাবে তাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করেন।

উৎসাহিত হওয়ার মতো বিষয় এটাই যে সরকার এবার গোপনীয়তার সংস্কৃতি ভেঙে ফেলতে এগিয়ে এসেছে। তথ্য অধিকার আইনের একটি বিধান তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে খুব সহায়ক। তাদের নিজেদের উদ্যোগে কিংবা জনগণ সেই তথ্য জানতে চাইলে সরকার এবং এনজিওগুলো আইনগতভাবে তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য (আইনে যেসব তথ্যের ব্যাপারে বিধিনিষেধ আছে, সেগুলো ছাড়া)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে এমন ইস্যুগুলোতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জনগণের কাছে জবাবদিহিতার আওতায় আনার অধিকার দিয়েছে তথ্য অধিকার আইন। এই প্রক্রিয়ায় দু'টি পক্ষ রয়েছে: একটি হলো সরবরাহ পক্ষ মানে সরকার ও এনজিওগুলো। অন্য পক্ষটি হলো চাহিদা পক্ষ, যেখানে রয়েছে জনগণ।

বিজিএমইএ ভবনের (বিজিএমইএ টাওয়ার) নির্মাণ প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন এবং বিদ্যমান দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থার চরম বহিপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। যে জমিতে ভবনটি নির্মিত হয়েছে তার সরকারি নিবন্ধন ছিল না। ওই জমিতে কোনো কাঠামো নির্মাণের অনুমোদনও ছিল না। ভবনটির নির্মাণের সময় ১৯৫৩ সালের নগর উন্নয়ন আইন (আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট) এবং জলাশয় সংরক্ষণ আইন মানা হয়নি। আর জমিটির প্রকৃত মালিক বিজিএমইএ নয়, বরং বাংলাদেশ রেলওয়ে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) জমিটি বাংলাদেশ রেলওয়ের কাছ থেকে কিনেছিল। পরে ইপিবি তা বিজিএমইএ-র কাছে বিক্রি করে দেয়। এ বিষয়ে আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, সরকার জনস্বার্থে জমিটি অধিগ্রহণ করেছিল। সরকারের সাংবিধানিক অধিকারের বলে তা করা হয়েছে। কিন্তু সরকার কোনো বেসরকারি কোম্পানির কাছে তা বিক্রি করতে পারে না। অধিগ্রহণের মাধ্যমে জনস্বার্থ পূরণ না হলে আইন অনুযায়ী সরকারের উচিত জমি মূল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া।

আদালত রায় দেয়- এ ধরনের একটি স্থানে কোনো ভবন তৈরির আগে কিছু শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। রায়ে উল্লেখ করা হয়, ভবনটি যে জমিতে নির্মিত হয়েছে বিজিএমইএ তার মালিক নয়। কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই এটি উচ্ছেদ করতে হবে। আইন ভঙ্গ করা ও অন্যান্য উদ্বেগের কারণে বিজিএমইএ ভবন ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভবনটি থেকে তাদের অফিস সরিয়ে নিতে সময় দেয়া হয়। আদালত অভিমত দেয়, হাতিরঝিল প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ীই হতে হবে। বেলা এখনো পূর্ণাঙ্গ রায়ের কপি পায়নি। তবে শেষ পর্যন্ত ফল যা-ই হোক প্রভাবশালী লোকদের জন্য এই রায় একটি চরম সতর্কতা হিসেবে কাজ করবে। এ মামলা প্রমাণ করেছে, তথ্য অধিকার আইন সাধারণ মানুষকে তাদের বক্তব্য ও অধিকার তুলে ধরা এবং তা প্রতিষ্ঠায় কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারে। ■

প্রতিটি শিশুর অধিকার আছে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকার তার এই অধিকার পূরণ করার দায়িত্ব আপনার, আমার, সমাজ ও রাষ্ট্রের। তাকে দিয়ে বিড়ির কারখানায়, আগুনের পাশে, ভবন তৈরির কাজে, মোটর গ্যারেজ ও ওয়েল্ডিং, ভারি যন্ত্রপাতির কাজ, আগুনের কাজ, এসিডের কাজ, কারখানায় কাজ, করানো যাবে না।

জনগণের চাহিদা মেটাতে সরবরাহ পক্ষ প্রস্তুত। ২২ হাজার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, চাহিদা অনুযায়ী তথ্য দেয়ার জন্য। এখন সময় হয়েছে নিজের অধিকার নিয়ে জনগণের সচেতন করার। জনগণকে তথ্য চাওয়ার ব্যাপারে বোঝাতে হবে যাতে কর্তৃপক্ষ কোনো ভুল না করতে পারে বা তথ্য প্রকাশের বিষয়টি এড়িয়ে যেতে না পারে।

তথ্য অধিকার আইন সরকারের একটি অঙ্গীকার পূরণ। এই আইনের তিনটি দিক আছে: নিজ থেকে সক্রিয় হয়ে তথ্য প্রকাশ, আবেদনের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ/অবমুক্তি এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও বন্ধুপ্রতীম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কবিষয়ক কিছু তথ্যের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ। এই আইনের মূল বিষয়বস্তু হলো, সুশাসন নিশ্চিত করা। এই সুশাসনের মানে কী? এর মানে হলো, আইনের শাসন, একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন এবং একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, যেখানে করদাতাদের অর্থ সঠিকভাবে জনগণের কল্যাণে ব্যয় হবে।

এই ক্যাম্পে ৩০ জন ব্যক্তিকে আলাদাভাবে তথ্য অধিকার বিষয়ে জানানো হয়। তাদের মধ্যে ছিল দিনমজুর, ভূমিহীন কৃষক ও ছাত্র। প্রথমে তাদের জানানো হয়, এই আইনের ব্যবহার কীভাবে তাদের জীবন ইতিবাচকভাবে বদলে দিতে পারে। পরের ধাপে তাদের শেখানো হয়, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কীভাবে তথ্য চেয়ে আবেদন করতে হয় এবং কেউ তথ্য না দিতে চাইলেই বা কী করতে হবে। নতুন ও সৃজনশীল কৌশলের মাধ্যমে সঙ্গীত, ভিডিওচিত্র, খেলা ও পোস্টার ব্যবহার করে তথ্য অধিকার আইন জনগনকে জানাণোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এতে তাদের শেখার বিষয়টি সহজ ও আকর্ষণীয় হয়েছিল।

ওই ক্যাম্পের একটি তাৎক্ষণিক প্রভাব লক্ষ করা গেছে। ইউএনওর কার্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় ও কিছু এনজিও কার্যালয়ে তথ্য চাওয়ার ৩৮টি আবেদন পড়ে। সব আবেদনই ছিল জনগণের সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত। একজন আবেদনকারী ভূমি কার্যালয় থেকে উপজেলার অর্পিত সম্পত্তির তালিকা চান। সঙ্গে জানতে চান কীভাবে এই সম্পত্তিগুলোর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং কারা এসব সম্পত্তি পেয়েছেন। আরেকজন আবেদনকারী উপজেলা কৃষি কার্যালয় থেকে জানতে চান, আগের বছর সরকারিভাবে কী পরিমাণ বীজ ওই কার্যালয়ে এসেছিল এবং তা কীভাবে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সবদিক বিবেচনায় ঐ ক্যাম্পটি ছিল একটি মাইলফলক। পরবর্তী সময়ে অবশ্য এর অনুকরণে আরো ক্যাম্প হয়েছে।

(এই লেখাটি দ্য ডেইলি স্টারের মতামত পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল)

তথ্য অধিকার ফোরাম কী ও কেন

বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিকে নিয়ে ২০০৮ সালে গঠিত হয় তথ্য অধিকার ফোরাম বা রাইট টু ইনফরমেশন ফোরাম। বাংলাদেশের জনগণের তথ্যের অধিকারের বিষয়টি এগিয়ে নেওয়া ও এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিসমূহের জোট হচ্ছে এই ফোরাম।

ফোরামের মূল লক্ষ্য:

১. তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইনের বিধিবিধানগুলোর বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি ও তা ছড়িয়ে দেওয়া;

২. সব উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রচেষ্টায় তথ্য অধিকারের বিষয়টিকে যুক্ত করা;

৩. আইনের মান্যতা নিশ্চিত করতে চাহিদা ও সরবরাহ দুই দিকে সক্ষমতা ও দক্ষতা সৃষ্টি করা এবং জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা;

৪. জনগণের তথ্যের অধিকারকে এগিয়ে নেওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রচারমাধ্যম, দাতা ও বেসরকারি খাতসহ উন্নয়ন সহযোগী ইত্যাদি সব স্টেকহোল্ডারকে সঙ্গে নিয়ে একত্রে কাজ করা;

৫. ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা এবং তথ্য সরবরাহকারী সংস্থা

ভবন, বাহন হতে হবে প্রতিবন্ধীবান্ধব

আমাদের প্রতিটি ভবন, বাহন হতে হবে প্রতিবন্ধীবান্ধব। অথচ ভবন বানানোর সময় বা বাহন পরিচালনার সময় আমরা একবারও কেউ এ বিষয়টি ভেবে দেখি না। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক। অথচ অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ব্যবস্থা রাখা হয় না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য তাদের সুবিধামতো আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে। কারণ এটা তাদের অধিকার।

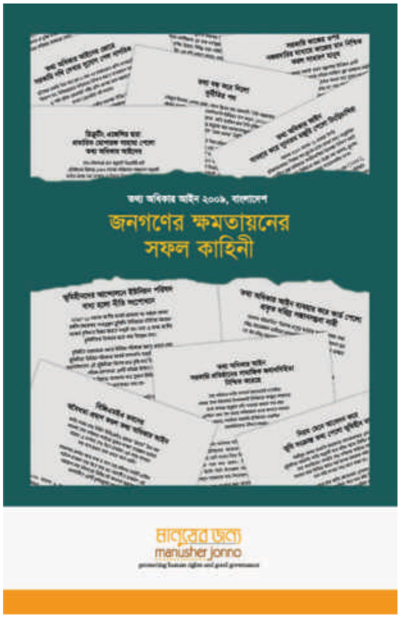

হিসেবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকার ওপর নজর রাখা; এবং

৬. এই আন্দোলনকর্মীদের একটি নেটওয়ার্ক এই ফোরাম। যারা কাজ করছেন বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি এই দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছ প্রশাসন প্রতিষ্ঠার ধারণাকে এগিয়ে নিতে। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন করা এবং এরপর এটি বাস্তবায়নের জন্য সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছেন তার অঙ্গীকার ও নীতির সঙ্গে এ ফোরামের কার্যক্রম পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। ফোরাম এখন এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তাও দেখার কাজ করছে।

সদস্য হওয়ার নীতিমালা এবং শর্তাবলী

ফোরামের সদস্যপদ সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত।

এ ছাড়া তারা যা যা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ:

- সরকার, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকরণ ও মানবাধিকার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তথ্য পাওয়ার ব্যাপারে জনগণের অধিকারের নীতিমালার ও চর্চা।
- তাদের নিজের প্রতিষ্ঠানে এবং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করা।
- আইনের বিধান মতো স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থ বিষয়ক সব তথ্য প্রকাশ করা।
- তথ্য চাওয়া যাবে এমন একজন তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া এবং নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে তা যথাযথভাবে সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেওয়া। আনুষ্ঠানিক চিঠির মাধ্যমে তথ্য কমিশন ও ফোরাম সচিবালয়কে তথ্য কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা অবহিত করতে হবে।
- তথ্যপ্রার্থীর আবেদন নাকচ হলে আপিল আবেদন করা যাবে এমন একটি আপিল কর্তৃপক্ষ গঠন করা।

কার্যক্রম

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার ফোরামের সচিবালয় হচ্ছে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)। এখন ফোরামের সদস্যসংখ্যা ৪৫। এর নিজস্ব ওয়েবসাইট হচ্ছে (http://www.rtiforum.org.bd)। এর মাধ্যমে আগ্রহী ব্যক্তিরা তথ্য অধিকার বিষয়ক সাম্প্রতিক হালনাগাদ তথ্য, দলিলপত্র ও আগামী কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারছেন। তথ্য অধিকার আইন ফোরামের সদস্যরা নিয়মিত বৈঠক করে মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এ ছাড়া তারা গবেষণা কাজ চালান এবং প্রতি বছর তথ্য অধিকারসহ বিভিন্ন দিবস পালন করেন। ফোরাম তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে। ফোরামের সদস্যরা অদূর ভবিষ্যতে কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছেন। এগুলো হলো: রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, কার্যকর তথ্য প্রকাশ নীতি বিষয়ক কর্মশালা এবং তথ্য কমিশনের রায়ের সংকলন।

ফোরাম এখন আঞ্চলিক পর্যায়ের ইস্যুগুলোতেও অভিমত দিচ্ছে। গত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের আগে ফোরাম সার্ক অঞ্চলে তথ্য অধিকারের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়। ফোরামের আহ্বায়ক ট্র্যান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি গ্রুপের (টিএজি) একজন সদস্য। এ বিষয়ে কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভের (সিএইচআরআই) সঙ্গে একটি জোরালো সম্পর্ক রয়েছে ফোরামের। ■

সরকারি কাজের ওপর সাধারণ মানুষের নজরদারি

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার পদুমশহর ইউনিয়নে একটি সরকারি স্কুলভবন সম্প্রসারণের কাজে অনিয়ম হয়েছিল। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে ভূমিহীন নেতারা যুক্ত হয়ে এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তুললে সরকারি কর্তৃপক্ষ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য হন। পরে সম্মিলিত চাপের মুখে ঠিকাদারও কাজটি যথাযথভাবে শেষ করেন-

মজিদের ভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান পদুমশহর ইউনিয়নে। সরকারি বিদ্যালয় হলেও এতে জায়গার অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যা ছিল। এ কারণে যথাযথভাবে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে শিক্ষকরা বিদ্যালয় ভবনের সম্প্রসারণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। ২০১০-২০১১ সালের নির্বাচনে ভূমিহীন সমিতি নেতা ফজলুল হক স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর ফজলুল হক বিদ্যালয় ভবনের সম্প্রসারণের ব্যাপারে ভূমিহীন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। সদস্যরা স্কুল ভবন সম্প্রসারণের দাবিতে তিন হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। ভূমিহীন নেতাদের সমর্থন পেয়ে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ভবন সম্প্রসারণের দাবিতে সবার স্বাক্ষরসহ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একটি স্মারকলিপি দেন।

ভবন সম্প্রসারণের আবেদনটি এক সময় অনুমোদিত হয়। এ সংক্রান্ত প্রকল্পটির নাম দেয়া হয় 'অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ'। ২০১০ সালের জুন মাসে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রকৌশল দপ্তর থেকে টেন্ডার আহ্বান করে। আবদুল হামিদ বাবু সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ায় তাকে কাজ দেওয়া হলেও, বাবু কাজটি স্থানীয় ঠিকাদার এনামুলকে সাব-কন্ট্রাক্ট দেন। কিন্তু এনামুল কাজের মান নিয়ে খুব একটা মনোযোগী ছিলেন না।

এটা দেখে ভূমিহীন সমিতি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অফিসের কাছে প্রকল্পটি সম্পর্কে তথ্য জানতে চায়। তারা যেসব তথ্য চায় তার মধ্যে ছিল ভবনের নকশা এবং উপকরণের স্পেসিফিকেশন। ২৬ সেপ্টেম্বর সমিতি এই তথ্য হাতে পাওয়ার পর নির্মাণ প্রকল্পটির পরিকল্পনা এবং প্রকৃত কাজের মধ্যে তারা অমিল দেখতে পায়। তখন ভূমিহীনরা নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে তাদের নির্মাণ প্ল্যান দাবি করেন। প্রতিষ্ঠানটি দাবি না মেনে হুমকি দেয় এবং তাদের

একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা

গত ২৬ আগস্ট ২০১৩ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এলএ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে আবেদন করেন দ্য ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার সিরাজগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি ও অনলাইন পত্রিকা দি নর্থ বেঙ্গল টাইম্স-এর সম্পাদক গোলাম মোস্তফা জীবন। আবেদনে তিনি সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় নির্মাণাধীন বিসিক শিল্প পার্কের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণকৃত জমির বিপরীতে ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানতে চান।

আবেদন করার পর তিনি বিভিন্নভাবে মানসিক ও দাপ্তরিক চাপের মুখে পড়েন। ৮ সেপ্টেম্বর তাকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশে

ওপর হামলা করার চেষ্টা করে। এ ঘটনার পর সমিতি উপজেলা প্রকৌশলী এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ছাড়া তারা এ নিয়ে জনমত তৈরি ও সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে ঠিকাদারের ব্যর্থতা তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেয়।

ভূমিহীনরা ২৯ সেপ্টেম্বর উপজেলা প্রশাসনের প্রকৌশলীর কাছে একটি স্মারকলিপি ও প্রায় দুশো লোকের স্বাক্ষর জমা দেয়। স্মারকলিপি দেওয়ার পর ভূমিহীন সমিতি সবাই মিলে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেয়। ১০ অক্টোবর উপজেলার সরকারি প্রকৌশলী, প্রধান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক আবদুল হামিদ এবং পদুমশহর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরিস্থিতি দেখতে ঘটনাস্থলে আসেন। প্রায় তিনশ নারী-পুরুষ তাদের সমর্থন জানান। তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, স্কুলভবনের ভিত তৈরি করতে যথাযথ উপকরণ ব্যবহৃত হয়নি। ভূমিহীন সমিতির সদস্যরা কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাবি করেন। এগুলো হচ্ছে-

১) কেন ঐ উপঠিকাদারকে কাজ দেয়া হলো
২) নির্মাণকাজের তথ্য চাওয়া হলেও ঠিকাদার কেন তা দেয়নি
৩) কেন বাইরের নির্মাণকর্মী নিয়োগ করা হলো
৪) কেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক নিয়মিত কাজ দেখতে আসেননি

ভূমিহীনদের প্রশ্ন শোনার পর প্রকৌশলী স্বীকার করেন যে, তত্ত্বাবধানের কাজে ঘাটতি ছিল। এর কারণে প্রকল্পে কিছু পরিবর্তন আনা হলো। মূল ঠিকাদারকে নিজেদের কাজটি করতে বলা হলো। তারা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ভিতটা নতুন করে তৈরি করেন। প্রকৌশলী নিয়মিত ভবনটি পরিদর্শনেরও অঙ্গীকার করেন। ভূমিহীনদের হস্তক্ষেপ ও প্রচেষ্টার ফলে স্থানীয় শ্রমিকদের দিয়েই স্কুল ভবন সম্প্রসারণের কাজ ৯ নভেম্বর সফলভাবে শেষ হয়। ■

তার সম্পাদিত অনলাইন পোর্টাল পরিচালনাকে অবৈধ উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সাত দিনের মধ্যে তার জবাব চাওয়া হয়। নোটিশে বলা হয়- জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণাপত্র (ডিক্লারেশন) ছাড়া অনলাইনে দি নর্থ বেঙ্গল টাইম্স নামে পত্রিকা প্রকাশ ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন ১৯৭৩ সনের ৫ ধারা বিধান-এর পরিপন্থী এবং উক্ত আইনের ৩২ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য।

এই চাপ কাটাতে তিনি তথ্য অধিকার আইনেরই আশ্রয় নেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনলাইন পত্রিকা প্রকাশের নীতিমালা চেয়ে আবেদন করা হয়। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত এক জবাবে বলা হয়, অনলাইন পত্রিকা (যা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় না, কেবল মাত্র অনলাইনে প্রকাশ হয়) প্রকাশের কোনো আইন, নীতিমালা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনো নির্দেশনা এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ফলে এরূপ তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এর পর তাকে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হয়। রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল করেও তিনি সম্পূর্ণ তথ্য পাননি। ফলে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তথ্য কমিশন পরবর্তী সাত কর্মদিবসের মধ্যে কেবল মোবাইল নম্বর ব্যতীত যাবতীয় তথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করেন। এর পরেও তথ্য কমিশনের লিখিত আদেশ না পাওয়ার দোহাই দিয়ে তাকে তথ্য প্রদান করা হয়নি। অবশেষে গত ৪ মার্চ তাকে ৫৭০ পৃষ্ঠার তথ্য দেওয়া হয়।

এভাবে তাকে তথ্যের চাহিদা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তাকে তথ্য কমিশন পর্যন্ত যেতে বাধ্য করা হয়েছে এবং তথ্য প্রদানে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য পেতে একজন সাংবাদিককে যে পরিমাণ বাধা এবং অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে সেখানে ওই একই ধরনের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে তথ্য পাবে সেটাই আমাদের প্রশ্ন। ■

তথ্য বন্ধ করে দিল দুর্নীতির পথ

রফিকুল ইসলাম একজন কৃষক, আগে ছিলেন লবণ ব্যবসায়ী। তিনি কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার লেমশিখালি ইউনিয়নে বাস করেন। ১৯৯১-এর ঘূর্ণিঝড়ে লবণ ব্যবসার বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছিল বলে তিনি কৃষিকাজ শুরু করেন। অবসরে এলাকার দরিদ্র মানুষের জন্য সমাজসেবামূলক কাজ করেন বলে এলাকার মানুষ তাকে 'চেঞ্জ মেকার' নির্বাচিত করেছে।

চেঞ্জ মেকার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে রফিকুল সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর একটি কর্মশালায় অংশ নেন এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে একটি ধারণা পান। এমজেএফের সহযোগী সংস্থা বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার ঐ কর্মশালাটি আয়োজন করেছিল ২০০৯ সালে। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে রফিকুল কীভাবে এলাকাবাসীর দাবি আদায় করেছিল নিচের ঘটনাটি এর প্রমাণ-

তথ্যের জন্য রফিকুলের আবেদন এবং তার ফল

২০০৯ সালের নভেম্বরে রফিকুল জানতে পারেন সরকার 'ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং' (ভিজিএফ) প্রকল্পের আওতায় লেমশিখালি ইউনিয়নের দুস্থদের মধ্যে বিনামূল্যে চাল বিতরণের পরিকল্পনা করছে। কাজের অভাব, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় খরাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাদ্য নিরাপত্তা দেওয়ার লক্ষ্যে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ভিজিএফ নামের এই খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিটি চালিয়ে থাকে।

মূলত দিনমজুর, ভূমিহীন বা যাদের শূন্য দশমিক ১৫ একরের কম জমি রয়েছে, প্রতিবন্ধী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং যাদের নিয়মিত আয়ের উৎস নেই এরকম ব্যক্তিদের সহায়তা দেওয়ার জন্য এ প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বা যখন খাবার দুষ্প্রাপ্য হয় তখন এক মাস বা কয়েক মাসের জন্য নির্বাচিত কিছু পরিবারকে রেশন হিসেবে খাবার দেওয়া হয়। তবে এ প্রকল্পের আওতায় খাবার পেতে হলে ভিজিএফ কার্ডের প্রয়োজন হয়।

বিনামূল্যে চাল বিতরণের খবর পেয়ে রফিকুল স্বপ্রণোদিতভাবেই কুতুবদিয়া উপজেলার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কাছে জানতে চান ভিজিএফ কার্ডের বিপরীতে জনপ্রতি কী পরিমাণ চাল পাওয়া যাবে। কিন্তু ঐ কর্মকর্তা তাকে কোনো তথ্য দেননি।

পরের দিন রফিকুল প্রকল্প কার্যালয়ে যান এবং বলেন প্রকল্পটি সম্পর্কে নাগরিকদের তথ্য দেওয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব। একথা শুনে প্রকল্প কর্মকর্তা রফিকুলকে জানান লেমশিখালীর ২৭২৫ জন দুস্থের মধ্যে ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হবে। যদিও রফিকুল তথ্যটি জানতে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করেননি তারপরও তিনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় প্রয়োজনীয় তথ্যটি জানতে পেরেছিলেন।

তথ্য জানার ফল

ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে চাল বিতরণের দিন চাল সংগ্রহ করতে আসা লোকজনকে চেয়ারম্যান জানান প্রতিটি ভিজিএফ কার্ডের বিপরীতে ৭ কেজি চাল দেয়া হবে। এটা শুনে রফিকুল প্রত্যেককে জানান, তিনি প্রকল্প কর্মকর্তার কাছ থেকে জেনেছেন ১০ কেজি করে চাল দেয়ার কথা। রফিকুলের কাছ থেকে এ কথা শোনার পর সবাই তাদের প্রাপ্য পুরোটা দাবি করলো। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তখন বলেন, তার পক্ষে পুরো চাল দেয়া সম্ভব নয়। কারণ এই চাল পরিবহনে এবং অন্যান্য কাজে তার অর্থ ব্যয় হয়েছে। যাই হোক, মানুষ প্রকৃত বরাদ্দ জানতে পেরেছিল বলে প্রতিবাদ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যানকে সাড়ে ৯ কেজি করে চাল দিতে বাধ্য করলো তারা ■

তথ্য অধিকার আইন: এমজেএফ ও এর সহযোগীরা কী করছে

মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন

কাজের জন্য বিদেশে যাওয়ার সময় অবশ্যই অভিবাসী শ্রমিককে তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বুঝে নিতে হবে। তাকে জানতে হবে সে কোন দেশের কোন কোম্পানিতে, কতো টাকা বেতনে, কতো দিনের জন্য কাজ করতে যাচ্ছে। তাকে জানতে হবে কোন রিক্রুটিং এজেন্সি তাকে চাকরির জন্য নিয়ে যাচ্ছে? আর প্লেনে চড়ার আগে তাকে বুঝে নিতে হবে জনশক্তি ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন, ভিসা, পরিচয়পত্র, বিমানের টিকেট, ওয়ার্ক পারমিট, বহির্গমন ছাড়পত্র। তা না হলে অভিবাসী শ্রমিককে ঠকতে হবে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)-এর লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র ও প্রান্তিকদের কল্যাণে অবদান রাখা। এ ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এমজেএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্পে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহৃত হয়। এর বাইরে চারটি সহযোগী সংগঠন এমন সব প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যা কেবলই তথ্য অধিকার বিষয়ে। ন্যায্য অধিকার ও তাদের প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন নাগরিকদের তথ্য অধিকার আইনের। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা হলে এই আইন কার্যকর হবে না। এ ছাড়া চাই এমন অনুকূল পরিবেশ যাতে সরকারের দেওয়া বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে জনগন প্রয়োজনীয় তথ্য চাইতে পারে। উন্নয়নের নামে এনজিওগুলো কী করছে নাগরিকদের তা জানার অধিকার আছে। কিন্তু বাস্তবে বিভিন্ন কারণে সাধারণ মানুষ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের উপকারিতা বোঝার সম্ভাবনা কমই থাকে।

আর সরকারি কর্মকর্তারাও এখনো তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষ হিসেবে তাদের দায়িত্ব এখনো পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি। এই প্রেক্ষাপটে এমজেএফ তার সহযোগীদের মাধ্যমে চাহিদা ও সরবরাহ দুই দিক নিয়ে কাজ করছে। তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এমজেএফ সুশীল সমাজের বিভিন্ন স্টাফদের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ উদ্যোগটি শুরু হয়েছিল ২০০৯ সালে। এ পর্যন্ত ৩৫টি ব্যাচে ৭৩২ জন এনজিওকর্মী তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

তথ্য প্রকাশ নীতি প্রণয়ন

এমজেএফ-এর আওতাধীন প্রকল্পগুলো তথ্য অধিকার আইনকে কাজে লাগানোর চাহিদা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সক্রিয় রাখে। এ ছাড়া এরা চেষ্টা করে সরকারি প্রশাসনকে জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ রাখতে। নীতিগত পর্যায়েও

এ উদ্যোগগুলোর প্রভাব পড়ে থাকে। উদাহরণ, পাঁচটি মন্ত্রণালয় ও তাদের সংশিলষ্ট দপ্তরগুলোর জন্য ৪৮টি তথ্য প্রকাশ নীতি (আইডিপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। বেশ কিছুসংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। আশা করা হয়, এর ফলে অবশ্যই একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে।

এমজেএফ-এর একটি সহযোগী সংগঠন তথ্য অধিকার ট্র্যাকিং সফটওয়্যার তৈরি করেছে যা দিয়ে কোনো কর্তৃপক্ষের তথ্য সরবরাহ করার রেকর্ডের ওপর নজর রাখা যায়। এতে যেসব তথ্য পাওয়া যাবে তা হচ্ছে, কোনো প্রতিষ্ঠান কতোগুলো তথ্য সরবরাহের আবেদন পেয়েছে, কতোগুলো প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, কতোগুলো আপিল আবেদন বা অভিযোগ হয়েছে ইত্যাদি। এর সহায়তায় তথ্য কমিশন প্রক্রিয়াটির ওপর লক্ষ রাখতে পারবে। সব কর্তৃপক্ষের মধ্যে যেন এ প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন ছড়িয়ে পড়ে সে লক্ষ্য নিয়েই এটি চালু করা হয়েছিল। এ নিয়ে একটি পাইলট কর্মসূচি চলছে। তথ্য অধিকার নিয়ে একটি ভিডিও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালও তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, তথ্য কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষেই এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য ব্যাপক প্রভাবের কথা বিবেচনায় রেখে বেশ কয়েকটি কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

দলিত জনগোষ্ঠী এই আইন ব্যবহার করছে

এমজেএফ সমর্থিত প্রকল্পগুলো কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। শ্রেণি, অঞ্চল, ধর্ম অথবা জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে নাগরিকরা তাদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করছে। এতে সরকারি কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দলিত জনগোষ্ঠীর কথা। প্রাত্যহিক জীবনে দলিতরা যে বৈষম্য বা অসমতার শিকার হয় তা মোকাবেলা করতে তারা এখন তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চাইছে।

ইনফো লেডি

একটি সহযোগী সংগঠন তাদের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে ‘ইনফো লেডি’দের মাধ্যমে। এই নারীরা তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রয়োগে দক্ষ। তারা সেবাদাতা ও গ্রহীতাদের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়ে দিচ্ছেন। তাদের মাধ্যমে সাধারণ জনগোষ্ঠী তথ্য চাওয়ার মাধ্যমে যেসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সম্ভব সেগুলো বিষয়ে জানতে পারছে। এমজেএফ-এর প্রকল্পগুলো প্রকল্পের পরিকল্পনা, আওতা, পরিকল্পিত উপকারভোগী ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বিভিন্নতাই অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এ রকম একটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী বা সম্ভাব্য উপকারভোগীদের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেওয়া। এতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এ ছাড়া এর মাধ্যমে সার্বিক আর্থিক নীতিতে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীবান্ধব সংস্কার করাও সম্ভব।

এমজেএফ ও এর সহযোগীরা আইনটিকে পরিচিত করে তুলতে তথ্য অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য শিক্ষা উপকরণ (আইইসি) তৈরি করেছে। এগুলোর মাধ্যমে যাদের সম্পর্কে তথ্য জানা দরকার ও যারা জানাতে চাইছে তারা দু’পক্ষই উপকৃত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই সহযোগী সংগঠনগুলো এমজেএফ-এর আইইসি উপকরণ ব্যবহার করে।

দেশভিত্তিক বিশ্লেষণ

তথ্য অধিকার ইস্যুতে কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভসের (সিএইচআরআই) সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এমজেএফ সম্প্রতি তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি বিষয়ে একটি দেশভিত্তিক বিশ্লেষণ শেষ করেছে। এ জন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে সিএইচআরআই কারিগরি সহায়তা দিয়েছে। এ সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডেজিগনেটেড অফিসার) নিয়োগ দেওয়ার পরিস্থিতি, তথ্য অধিকার আইন আইন বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ধারণা, আপিল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তার নিয়োগ ও পরিচিতি পরিস্থিতি, তথ্য প্রকাশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, ওয়েবসাইট অডিট, তথ্য অধিকার

শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ ও পরিশোধকালে একই ধরনের কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিককে সমান মজুরি দিতে হবে। এতে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী এটা দণ্ডনীয় অপরাধ।

আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়সমূহ ও তথ্য কমিশনের ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া।

এমজেএফ-এর বড় তিনটি কাজ

- ২০১১ সালে মানিকগঞ্জ জেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলট কর্মসূচি চালায়। মানিকগঞ্জ জেলার আটটি দপ্তরের ৫৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (পাইলট এলাকা হিসেবে) তথ্য অধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিপিএটিসিতে ওই প্রশিক্ষণ হয়। তথ্য অধিকরি বিষয়ে চাহিদা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি পর্যায়ে ৫টি এনজিও যুক্ত ছিল। এ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের জানানো হয়।
- ২০১২ সালে তথ্য কমিশনের সঙ্গে যৌথভাবে তিনটি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তথ্য প্রকাশ বিষয়ে কাজ করার উদ্যোগ নেয়। মন্ত্রণালয়গুলো হলো– তথ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং মহিলাো ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ওই উদ্যোগের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও তাদের অধীনস্থ দপ্তরগুলো তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অভিযোগের ওয়েবসাইট ও বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো হালনাগাদ করে।
- দেশে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সর্বোচ্চ কেন্দ্র। লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) ও এমজেএফ বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় একটি যৌথ উদ্যোগে কাজ করেছে। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য একটি ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্সের মধ্যে তথ্য অধিকারের বিষয়টি রাখা হয়েছিল। ৭৪৫ জন সরকারি কর্মকর্তা এ বিষয়ে ৩ দিনের ৩টি প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

এমজেএফ বাংলাদেশে তথ্য অধিকারের বিষয়টিকে এগিয়ে নিতে সহযোগী সংগঠনদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। তথ্য চাওয়া ও দেওয়ার কাজটি পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা করা গেলে তা অবশ্যই একসময় প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনবে।

নিয়ম মেনে আবেদন করে তথ্য পেলো ভূমিহীন মানুষ

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার আলেকজান্ডার এলাকার ভূমিহীনরা সরকারি আইন অনুযায়ী খাস জমির বরাদ্দ দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন। সম্প্রতি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যর্থ হলেও উপজেলা পর্যায় থেকে তারা খাস জমি সংক্রান্ত তথ্য পেতে সক্ষম হন।

কাগজপত্র জাল করে স্থানীয় জোতদাররা এলাকার খাস জমির বেশির ভাগ দখল করে রেখেছিল। আর খাস জমি বিতরণে সরকারি কর্মচারীদের অসততা ও নিস্পৃহ ভাব তাদের সুবিধা করে দিয়েছিল। এ বছর ভূমিহীনদের সমিতি তথ্য অধিকার আইনের সহায়তায় এলাকার খাস জমির প্রকৃত অবস্থা জানতে উদ্যোগী হয়-

প্রথম ব্যর্থতা

আলেকজান্ডার এলাকার ভূমিহীন সমিতির সদস্য রিয়াজ ২০১০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ইউনিয়নের সহকারী ভূমি কর্মকর্তার কাছে খাস জমির তথ্য চেয়ে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করেন। সহকারী ভূমি কর্মকর্তা আবেদনটি গ্রহণ করে তাতে স্বাক্ষর করে দেন। নির্ধারিত দিনে তথ্য আনতে গেলে রিয়াজকে তথ্য না দিয়ে তাকে আবার উপজেলা ভূমি কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে বলা হয়।

দ্বিতীয় আবেদনে সাফল্য

ভূমিহীন সমিতির একটি সভায়, ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অসহযোগিতার ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ করার সিদ্ধান্ত হয়। ২৪ নভেম্বর একশরও বেশি ভূমিহীন মানুষ মিছিল করে উপজেলা ভূমি অফিসে যান। তারা উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্য কর্মকর্তার কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ করেন যে, ইউনিয়ন ভূমি অফিস কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তাদের তথ্য দেয়নি। সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভূমিহীনদের সম্মিলিত দাবির মুখে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন। সহকারী কমিশনার বলেন, উপজেলা ভূমি অফিসে একজন তথ্য কর্মকর্তা কর্মরত আছেন এবং তাঁর কাছে আবেদন করলে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য পাওয়া যায় তারা সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। এর প্রেক্ষাপটে ঐদিনই সিদ্দিকুর রহমান নামে একজন ভূমিহীন কৃষক উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্য কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

খাস জমি সংক্রান্ত যা যা তথ্য ভূমিহীনরা জানতে চেয়েছিল, উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্য কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবই সরবরাহ করেন। এ ব্যাপারে ভূমিহীনদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, মৌখিকভাবে অভিযোগ করলে কোনো ফল হবে না। এ কারণেই ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অসহযোগিতার ব্যাপারে প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বা নিতে পারেনি। ভূমিহীনরা সিদ্ধান্ত নেন এর পর থেকে অভিযোগ করলে তা লিখিত এবং যৌথভাবে করতে হবে। ■

তথ্য অধিকার আইন

একজন সরকারি কর্মকর্তা কীভাবে দেখেছেন

শরীফ নজরুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, বাগেরহাট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য পাওয়ার অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণ প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। আর জনগণ ক্ষমতায়িত হলে কী হবে? সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এই মহান ব্রত সামনে রেখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করা হয়, যা ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়। এর আগে একই উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালে তথ্য অধিকার আদেশ, ২০০৮ প্রণয়ন করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত সরকার সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে জাতীয় সংসদে পাস করে অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত করে।

তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারা অনুসারে ২০০৮ সাল থেকেই আমি কোনো-না-কোনো অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। আমার অভিজ্ঞতা হলো, আইনটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ খুব একটা জানে না এবং অধিকাংশ কর্মকর্তা আইনটি সম্পর্কে খুব একটা জানেন না।

২০১১ সালে যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য শাখায় সিনিয়র সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় আমি তথ্য প্রাপ্তির একটি আবেদন পেন্ডিং পাই। ততো দিনে ১৮ কার্য দিবস পার হয়ে গেছে। যদিও আমি তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলাম না। আমি নথিটিতে একটি স্বয়ংসম্পুর্ণ নোট দিয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মহোদয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করি। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য বিভিন্ন শাখায় পত্র না পাঠিয়ে আমাকে দায়িত্ব দিলেন তথ্যের জন্য আবেদনকারীকে কতো টাকা পরিশোধ করতে হবে তা নির্ধারণ করতে। আমি একজন অফিস সহকারীকে দিয়ে দুটি শাখায় খোঁজ নিয়ে খসড়া হিসাব করে দেখলাম, আবেদনকারীকে আইনের ৯ (৭) ধারানুসারে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে চাহিদাকৃত তথ্য নিতে হবে। কারণ খতিয়ানের মুদ্রিত মূল্য অনেক বেশি।

আমি আবেদনটি পেয়ে খুশি হয়েছিলাম। কারণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হওয়ার পর এটিই আমার প্রথম কাজ। আমি আবেদনকারীকে তাঁর মোবাইল ফোনে ফোন দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে চা খাওয়ার দাওয়াত দেই। তিনি এলেন। আবেদনকারী যশোরের বহুল প্রচারিত গ্রামের কাগজ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক, সবার প্রিয় মিষ্টভাষী আসাদ ভাই। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ তথ্য দিয়ে তিনি কী করবেন। তিনি জানালেন, সরকারের সফলতা তিনি পত্রিকায় তুলে ধরবেন। তিনি ২০১০-১১ অর্থবছরে টিআর ও কাবিখা খাতে গৃহীত প্রকল্পের অনুলিপি এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ড রুম থেকে প্রদত্ত

খতিয়ানসমূহ চেয়েছিলেন। আইন অনুসারে প্রতি পৃষ্ঠা তথ্যের মূল্য ২ টাকা করে। কিন্তু খতিয়ানে মুদ্রিত মূল্যের কারণে এত বেশি টাকা তথ্যের মূল্য দাঁড়িয়েছিল। তাঁর তথ্য চাওয়ার উদ্দেশ্য শুনে আমি বলেছিলাম, তাহলে তো আপনার মাত্র চারটি বাক্য দরকার, যা লিখলে ২ লাইন হবে। কত টাকা রেকর্ড রুম থেকে আয় হয়েছে এবং টিআর ও কাবিখার মোট বরাদ্দ কত মেট্রিক টন খাদ্যশস্য, কতগুলো প্রকল্প নেয়া হয়েছে– তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু কোনো ডকুমেন্ট দেয়া হয়নি বা তাঁর কাছে থেকে কোনো মূল্যও গ্রহণ করা হয়নি।

আমি জানতাম অনেকেই তথ্য নিতে আসেন। তাঁরা অফিস সহকারীর কাছে তথ্য চান। কেউ তথ্য পান আবার অনেকেই তথ্য না দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সমস্যাটি কোথায়? সমস্যা মূলত আবেদনকারী তথ্য অধিকার আইন ভালোমতো জানেন না। আবার ঐ অফিস সহকারীও জানেন না। আর তথ্যের মূল্য বাবদ প্রাপ্ত টাকা কোথায় জমা দিতে হবে, তাও অনেকে জানেন না। ২০০৮ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেও আমি তথ্য কমিশন বা অন্য কোথাও থেকে জানতে পারিনি তথ্য দিয়ে পাওয়া অর্থ কোথায় জমা দেবো। জানতে পারি ২০১৪ সালের মাঝামাঝি এসে।

অনেক তথ্য রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন। এ তথ্য না পেলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তথ্য পেতে বারবার অফিসে ঘুরছেন। কিন্তু হয়তো স্থানীয় প্রভাবশালীদের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, বিষয়টি গোপন রাখতে হবে বা তথ্য দেয়া যাবে না। তাই তিনি তথ্যটি পাচ্ছেন না। সে ক্ষেত্রে ওই তথ্যবঞ্চিত ব্যক্তিকে যদি পরামর্শ দেয়া যায় যে, আপনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৮ ধারা মোতাবেক আবেদন করুন। তাহলে তিনি তথ্য পেয়ে উপকারী হতে পারেন। আবার কর্তৃপক্ষ আইনের বাধ্যবাধকতা দেখিয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের রোষানল থেকে মুক্ত হতে পারেন।

২০১৪ সালের জুন মাসে তৎকালীন কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম যশোরে এসেছিলেন তথ্য অধিকার নিয়ে আলোচনা করার জন্য। তিনি আমাদের এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁর কাছে আমি তথ্যের মূল্য বাবদ জমা নেয়া টাকা জমা দেয়ার চালান কোড নম্বর জানতে চাইলে তিনি কোড নম্বরটি মৌখিকভাবে জানান '১৮০৭'। এর আগে আমি এমআরডিআই কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালাতে এই অসুবিধার কথা জানাই। সেখানেও প্রশিক্ষক বলেন, পরে জানাবেন। যেকোনো দায়িত্ববান ব্যক্তির কাছে অর্থনৈতিক কোড নম্বরের কথা বললেই রেগে গিয়ে বলেন, চিঠি দেয়া হয়েছে। হিসাবরক্ষণ অফিসের কাছে জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, পরে জেনে বলবো। আমার সহ-প্রশিক্ষণার্থীরা বলেন, প্রশ্ন করে বেশি কথা শোনার দরকার কী। কেউ আবার একটু বাড়িয়ে বলেন, বেশি বোঝেন? যে যা-ই বলুক না কেন, কে কতোটি তথ্য দিচ্ছে, এটি বড় কথা।

মনিরামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় গত ছয় মাসে ১১টি তথ্য দিয়েছে, যেগুলো না দেয়ার জন্য প্রভাবশালীদের পরামর্শ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে আমি তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করতে বলি ও তথ্য প্রদান করি। তথ্যের জন্য সাধারণ মানুষের আবেদন সহজতর করতে আমি তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্বারা আবেদনের জন্য নির্ধারিত 'ফরম ক' কপি করে রেখে দিয়েছি। কেউ তথ্য চাইলে তাকে ঐ ফরমে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করি। আবেদনকারীরা খুশি হন। তথ্যের মূল্য পরিশোধ করে তথ্য নেন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সরকারি কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। তাঁকে দুর্নীতিমুক্ত হয়ে স্বাচ্ছন্দে কাজ করার পরিবেশ দিয়েছে। তাঁকে প্রভাবশালীদের চাপমুক্ত করেছে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান ও ন্যায়বিচার করার হাতিয়ার উপহার দিয়েছে।

আমি মনে করি, তথ্য দেওয়া ও এই আইনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত। জনসচেতনাতা বাড়ানোর জন্য সরকার ও বেসরকারি সবাই মিলে ব্যাপক প্রচার চালানোর উচিত। তাহলে সরকারের উচ্চ পর্যায়সহ সর্বত্র জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। সরকারের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং সেই সাথে জনগণের সেবা উদ্যোগ নিশ্চিত হবে। ■

সাধারণ মানুষের অন্যতম হাতিয়ার "তথ্য অধিকার আইন"

মোঃ মাহমুদ হাসান রাসেল
উন্নয়নকর্মী

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রয়েছে সংবিধান। এই সংবিধানেই নাগরিকের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সচেতনতার অভাবেই নাগরিকরা তা সহজে আদায় করতে পারে না। আবার অন্যভাবে বলা যায়, তথ্য না জানার কারণে তারা অসচেতন। নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে কি হবে না ও তারা সেবা পাবে কি পাবে না, তা নির্ভর করে ঐ সেবা সংক্রান্ত তথ্য কতোটুকু তারা জানে তার ওপর।

জণগণকে সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার জণগণের কাছ থেকেই পেয়ে থাকে। অর্থাৎ নাগরিকের টাকাতেই নাগরিককে সেবা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছে সরকার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো নাগরিকের জন্য কী কী সেবা আছে তা সম্বন্ধে নাগরিকরা জানেন না। কারণ যারা সেবাগুলো দেয় তারাই তা গোপন রাখে। তারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকে। আর এর সুফল ভোগ করে দুর্নীতিবাজরা।

যেমন সরকারি হাসপাতালের একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানেন যে, নাগরিকের জন্য কী কী ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়ার নিয়ম আছে। নাগরিকদের কাছ থেকে এই তথ্য গোপন করা হলে সেই ওষুধ অন্যায়ভাবে বাইরে বিক্রি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু নাগরিকরা যদি জানতে পারে যে কী কী সেবা তাদের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে, তাহলে ঐ হাসপাতালের কর্মচারী-কর্মকর্তারা দুর্নীতি করা থেকে বিরত থাকবেন বলে আশা করা যায়। অর্থাৎ যতোদিন পর্যন্ত নাগরিক তার সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য না চাইবে, ততোদিন দুর্নীতি চলতেই থাকবে।

একইভাবে জনগণ যতোদিন দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন না করবে, ততোদিন পর্যন্ত সরকার তার দায়িত্ব পালনে অবহেলো করার সুযোগ পাবে। ফলে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি কমাতে জনগণের ঐ সেবাসংক্রান্ত তথ্য জানতে চাওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে যতো বেশি স্বচ্ছ হবে, ততো তাদের কাজের জবাবদিহিতাও তৈরি হবে।

ক্রেতা হিসেবে আমার যেমন অধিকার রয়েছে খাবারের প্যাকেটে খাদ্য উপকরণ, খাদ্যগুণ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানার, রোগী হিসেবেও তেমনি রোগের তথ্য জানার একশত ভাগ অধিকার আমার রয়েছে। সমাজের সর্বস্তরে তাই যথার্থ তথ্যের প্রকাশ ও তা প্রচারের চর্চা থাকা উচিত। এ ধরনের চর্চার মাধ্যমেই সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক চেতনা তৈরি হয়; বিকশিত হয় গণতান্ত্রিক চর্চা।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য জানার অধিকার কার্যকর করার লক্ষ্যে ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস হয়। ১ জুলাই ২০০৯ থেকে আইনটি কার্যকর হয়। এই আইনের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সরকার, সরকারি বা বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সকল এনজিও এর কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য এখন সাধারণ জনগণের জানার আওতায় আনা হয়েছে। আইনে নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রত্যেক সরকারি, বেসরকারি অফিসে একটি তথ্য প্রদান ইউনিট থাকবে এবং একজন ব্যক্তি তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন যিনি আবেদন পাবার ২০ দিনের মধ্যে জনগণকে তথ্য প্রদান

করবেন। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার যুগান্তকারী এই আইনটির প্রয়োগ কতোটা হবে তা নির্ভর করছে আইনটিকে সাধারণ মানুষ কীভাবে এবং কতোটা ব্যবহার করতে পারছে তার ওপর।

কেন তথ্য অধিকার আইন

সাধারণভাবে জনগণের জন্য সরকারি তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হওয়াকে বলে তথ্য অধিকার। সংবিধানের ৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনগণ রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক। দুর্ভাগ্যবশত, রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক সাধারণ জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য রাষ্ট্রের কাছে পায় না। রাষ্ট্রের কর্মচারীরা মালিকদের কাছে তথ্য গোপন রেখে জন্ম দিয়েছে অস্বচ্ছতা এবং গোপনীয়তার সংস্কৃতি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি তৈরি করতে হলে জনগণের সাধারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে সহায়ক তথ্যগুলো সহজলভ্য করা একান্ত আবশ্যক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (হুইসেল ব্লোয়ার প্রটেকশন অ্যাক্ট ২০০৭) ও ব্রিটেনের (পাবলিক ইন্টারেস্ট ডিসক্লোজার অ্যাক্ট ১৯৯৮) আইনের মতো বাংলাদেশের আইনেও তথ্য প্রদায়ক সুরক্ষার বিষয়টি রয়েছে। সুশাসন ও স্বচ্ছতার লক্ষ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো সদস্য যদি কোনো তথ্য, আইন দ্বারা অব্যাহতি প্রাপ্ত নয় এবং সেই প্রতিষ্ঠানের জনস্বার্থবিরোধী কোনো তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করে তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠান ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না। সেক্ষত্রে তিনি তা সরল বিশ্বাসে করেছেন, এটা প্রমাণ করতে হবে। তবে সরকারি আচরণবিধি ১৯৭৯-এর ধারা ১৯-এ এক বিভাগের তথ্য অন্য বিভাগে দেওয়া হলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। তবে আইনের ধারা ৩-এর খ অনুসারে তথ্য অধিকার আইন প্রাধান্য পাওয়ায় শাস্তির হাত থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা রেহাই পেতে পারেন।

তাই সরকারি সেবাসহ অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে তথ্য গোপন কিংবা তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহার প্রবণতা দূর করে জনগণকে সহায়তা করার জন্যই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

তৃতীয় পক্ষের দায়িত্বের অস্পষ্টতা

তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে জড়িত তথ্য প্রকাশের বিষয়টি স্পষ্ট নয়। ভোক্তা অধিকার থেকে শুরু করে ব্যক্তিখাতের দুর্নীতির তথ্য সরাসরি পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা এই আইনে নেই। অস্পষ্টতার কারণে দ্বিতীয় পক্ষ তথ্য দিতে গিয়ে অসুবিধার ভেতর পড়বেন। নাগরিক হতে পারেন বিড়ম্বনার শিকার। ভারতে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের ভূমিকাকে একটি সময়সীমা বেধে দেওয়া হয়েছে। ফলে দ্বিতীয় পক্ষকে কোনো অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে তৃতীয় পক্ষ। সরাসরি তথ্য দিতে তারা বাধ্য নয়। কিন্তু কোনো নাগরিক ব্যক্তিমালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানতে চাইলে, তা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বা চুক্তিকারী সংস্থার কাছ থেকে পেতে পারবে। যেমন-গ্রামীণফোনের সেবার গুণগত মান সম্পর্কে কোনো তথ্য জানতে চাইলে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস অথরিটির কাছে তা জানতে পারবে। সমস্যাটা এখানেই, গ্রামীণফোন কর্তৃপক্ষ এখানে তৃতীয় পক্ষ আর তাদের তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেওয়া হয়নি। ফলে অসুবিধায় পড়তে পারে দ্বিতীয় পক্ষ অর্থ্যাৎ টেলিকমিউনিকেশনস অথরিটি। এছাড়াও কোনো নাগরিক সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো তথ্য চাইলে, আর সে তথ্য তাদের কাছে না থাকলে, তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করতে পারবে। তবে তৃতীয় পক্ষ কয়দিনের মধ্যে সরবরাহ করতে বাধ্য, সে সম্পর্কে কিছু বলা নেই।

তথ্যমূল্য ও দারিদ্র্য

রাষ্ট্রের দায়িত্ব দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সকল নাগরিকের তথ্য পাওয়া অধিকার নিশ্চিত করা অর্থাৎ বিনামূল্যে তথ্য সরবরাহ করা। ভারতে তথ্য অধিকার আইনের অধীনে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ সর্ম্পূণ বিনামূল্যে তথ্য পেতে পারে। কিন্তু

বাংলাদেশের আইনে তথ্য একদম বিনামূল্যে পাওয়া যাবে না। তবে বাংলাদেশের আইনের ধারা ৮(৫) এ বলা হয়েছে-'ক্ষেত্রমত, কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণিকে উক্ত মূল্য প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।' অর্থাৎ বিনামূল্যে তথ্য প্রাপ্তির একটা সুযোগ রয়েছে।

যেসব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদাণে বাধ্য

আইন অনুযায়ী যে কোনো নাগরিক নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কাছে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য চাইতে পারে এবং প্রতিষ্ঠান কিংবা সংস্থা চাহিদা অনুযায়ী তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে:

- সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোনো সংস্থা। যেমন–তথ্য কমিশন, নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;
- সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;
- কোনো আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা বা এর অধীনে গঠিত কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;
- সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল হতে সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;
- সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত যুক্তি মোতাবেক সরকারি কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; এবং
- সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।

কী ধরনের তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

● প্রতিষ্ঠানের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য, যেমন: যে কোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব। বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোনো ইন্স্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিল এবং ভৌত গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোনো তথ্যবহ বস্তু বা তার প্রতিলিপি। তবে দাপ্তরিক নোট শিট বা নোট শিটের প্রতিলিপি প্রদান বা পরিদর্শন করতে দেওয়া হবে না।

কোন কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন প্রযোজ্য হবে না

- জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)
- ডাইরেক্টরেট জেনারেল ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই)
- প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ
- ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), বাংলাদেশ পুলিশ
- স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেলো
- স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ
- র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর গোয়েন্দা সেলো।

কোন ধরনের তথ্য প্রকাশ এই আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নয়

- বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এই ধরনের তথ্য;
- পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
- প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;
- জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচারকাজ ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;
- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই ধরনের বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য;

- কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এরূপ তথ্য;
- তদন্তাধীন কোনো বিষয় সম্পর্কিত তথ্য যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

কীভাবে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়া যাবে

- যে প্রতিষ্ঠানের তথ্য আমি পেতে চাই সে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্যের জন্য নির্ধারিত ফরমে বা সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে। ই-মেইলেও আবেদন করা যাবে;
- আবেদনপত্র জমা নেওয়ার ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করবেন। তবে চাহিদাকৃত তথ্য সংগ্রহ করতে যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা থাকে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন;
- তথ্য প্রদানে ফি ও তথ্যের মূল্যের প্রয়োজন হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্র জমা নেওয়ার ৫ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে পরিশোধ করার জন্য অবহিত করবেন;

- তথ্য প্রদান করতে না পারলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার কারণ উল্লেখ করে আবেদনকারীকে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে জানাবেন;
- ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে তথ্য পেতে যে ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেবেন।

উল্লেখ্য, অনুরোধকৃত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।

কীভাবে আবেদন করতে হবে

জনগণকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করার জন্য প্রত্যেক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত বা নিয়োগ করবে। উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র জমা দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দেবেন যেখানে আবেদনের রেফারেন্স নম্বর, আবেদনপত্র গ্রহণকারীর নাম, পদমর্যাদা এবং আবদন গ্রহণের তারিখ উল্লেখ থাকবে। চিত্র-৪ এ নমুনা দেখানো হয়েছে।

যেসব সংস্থা / প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা আর্থিক জরিমানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয় শাস্তি হতে পারে:

- যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়া তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ গ্রহণ অস্বীকার;
- যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়া আপিল গ্রহণ অস্বীকার;
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান বা সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ হলে;
- ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করলে; এবং
- কোনো তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে।

কোন মাধ্যমে তথ্য পাওয়া যাবে এবং তথ্য পাওয়ার জন্য কতো ফি দিতে হবে?

আবেদনকারী তার চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ফটোকপি, পরিদর্শন, নোট অথবা ইলেক্ট্রনিক ফরমেট যেমন: সিডি, ডিস্ক ইত্যাদিতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে সংগ্রহ করতে পারবেন এবং বিনামূল্যে বিতরণের জন্য যে সকল প্রকাশনা থাকবে তা বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়া প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পাবার অধিকার আছে:

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য
- প্রকাশিত প্রতিবেদন
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব নিয়ম-কানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়েল, তালিকাসহ রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণিবিন্যাস

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে লাইসেন্স, পারমিট অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি পাওয়ার শর্তসমূহ ও শর্তের কারণে কোনো ধরনের লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে শর্তসমূহের বিবরণ
- অনুমোদন বা অন্য কোনো সুবিধা প্রাপ্তির বিবরণ
- নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা
- কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঐ সব নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণের ব্যাখ্যা
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা প্রচার ও প্রাপ্তির জন্য তথ্য কমিশন প্রদত্ত নির্দেশনা
- মন্ত্রী পরিষদ কোনো সিদ্ধান্ত নিলে সিদ্ধান্তের কারণ এবং ভিত্তি সম্পর্কিত তথ্য, তবে শর্ত আছে যে, দাপ্তরিক নোট শিট বা নোট শিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সারণি-৪ অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ প্রদান করতে হবে।

সারণি-৪

তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যম	তথ্য প্রাপ্তির ব্যয়
লিখিত ডকুমেন্টের কপি (ম্যাপ, নকশা, প্রতিপৃষ্ঠা ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে ২ টাকা হারে এবং তদুর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য
লিখিত ডকুমেন্টের কপি (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ টাকা হারে এবং তদুর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য)
কোনো আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্য	বিনামূল্যে

- তথ্য পাওয়ার জন্য ফি বা মূল্য, নগদ, মানি অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, ক্রসড চেক অথবা স্ট্যাম্পের মাধ্যমে প্রদান করা যাবে

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়া গেলে কী করণীয়?

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিদাকৃত তথ্য না পাওয়া গেলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবেন। আপিল গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দেবেন অথবা আপিল খারিজ করবেন। চিত্র-৫ এ নমুনা দেখানো হয়েছে।

আপিলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে সরাসরি অভিযোগ করতে হবে তথ্য কমিশনে।

তথ্য কমিশন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকার ১ জুলাই ২০০৯-এ তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে। তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে তথ্য কমিশন কোনো ব্যক্তির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বা স্বপ্রণোদিত হয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করতে পারবে।

- কোনো কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করলে বা তথ্যের অনুরোধ গ্রহণ না করলে;
- তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হলে;
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব না পেলে;
- তথ্যের জন্য অযৌক্তিক মূল্য দাবি বা আদায় করলে;
- এই আইন সম্পর্কিত অন্য কোনো বিষয়।

প্রতিষ্ঠানসমুহ স্বপ্রণোদিত হয়ে কীভাবে তথ্য প্রকাশ করবে?

আইনের আওতাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সকল তথ্য নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য হয়, এরূপে সূচিবদ্ধ করে সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রচার করবে।

দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় গর্ভবতী নারী যেন বিনা খরচে মাতৃত্বকালীন চিকিৎসা সুবিধা পেতে পারে এজন্য সরকার চালু করেছে নিরাপদ মাতৃত্ব স্বাস্থ্য ভাউচার কার্ড। দেখা গেছে, গ্রামে এই কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রকৃত দরিদ্র নারীরা বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে অবস্থাপন্ন ঘরের নারী এই কার্ডের সুবিধা ভোগ করছে। দরিদ্র নারীরা অনেকে এই কার্ডের কথা জানে না, জানলেও এটা জানে না যে এই কার্ড পাওয়াটা তাদের অধিকার। অধিকার সম্পর্কে না জানলে যেমন অধিকারহীনতা বোঝা যায় না, তেমনি অধিকার আদায়ও করা যায় না।

প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নে উল্লেখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রতি বছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ ও জনগণের জন্য উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করবে। বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উক্ত প্রতিবেদন সহজলভ্য করবে এবং নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখবে।

- প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পদ্ধতি বা বিবরণ;
- প্রতিষ্ঠানের সকল নিয়ম-কানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল ইত্যাদির তালিকা;
- প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোনো প্রকার সেবা পাওয়া যাবে তার বিবরণ: এবং
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফ্যাক্স নম্বর।

এ ছাড়া কোনো নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা প্রকাশ করবে এবং প্রয়োজনে উক্ত নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করবে। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো পন্থায় প্রচার ও প্রকাশ করবে।

আপিল ও জরিমানা

কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্য্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান অথবা কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান অথবা কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান (ধারা ২-ক)।

কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোনো সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার বা সিদ্ধান্ত লাভ করার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করতে পারবেন। আপিল কর্তৃপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হন যে, আপিলকারী যুক্তিসংগত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারেন তাহলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপিল আবেদন গ্রহণ করতে পারবেন।

আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপিল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবেন অথবা তদ্বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হলে আপিল আবেদনটি খারিজ করে দেবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন (ধারা - ২৪)

কখন তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের করা যাবে?

তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা, তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হলে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোনো জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হলে তথ্যের এমন অংকের মূল্য দাবি করা হলে বা প্রদানে বাধ্য করা হলে, যা তার বিবেচেনায় যৌক্তিক নয়, অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা যা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলে মনে হলে, আপিলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে, তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তপ্রাপ্ত না হলে কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন (ধারা-২৫)।

তথ্য কমিশন কীভাবে এবং কতোদিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে পারবে?

অভিযোগ প্রাপ্তির পর কোনো কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হলে প্রধান তথ্য কমিশনার উক্ত অভিযোগটি স্বয়ং অনুসন্ধান করবেন অথবা অনুসন্ধানের জন্য অন্য কোনো তথ্য কমিশনারকে দায়িত্ব প্রদান করবেন। দায়িত্ব গ্রহণ বা প্রপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান সম্পন্ন করে প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনের জন্য একটি সিদ্ধান্ত কার্যপত্র প্রস্তুত করবেন। সিদ্ধান্ত কার্যপত্র তথ্য কমিশনের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং তথ্য কমিশনের সভায় আলোচনাক্রমে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কোনো অভিযোগের অনুসন্ধানকালে যে কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় সেই কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে, তার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করতে হবে। কোনো অভিযোগের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তৃতীয় পক্ষ যুক্ত থাকলে তথ্য কমিশন উক্ত তৃতীয় পক্ষকেও বক্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদান করবে। প্রাপ্ত অভিযোগ তথ্যকমিশন সাধারণভাবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে। তবে অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা কোনোক্রমেই ৭৫ (পঁচাত্তর) দিনের অধিক হবে না (ধারা-২৫)।

অভিযোগ প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশনের করণীয় কী?

কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রপ্তির কোনো অনুরোধ বা আপিল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করতে কিংবা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন, অসদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোনো অনুরোধ বা আপিল প্রত্যাখ্যান করেছেন, যে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করা

হয়েছিল তা প্রদান না করে ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করেছেন, কোনো তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন তা হলে তথ্য কমিশন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্তরূপ কার্যের তারিখ হতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য সর্বনিম্ন ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা আরোপ করতে পারবে এবং জরিমানার মোট পরিমাণ কোনোক্রমেই ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হবে না। নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে কোনো কর্মকর্তা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এমন কার্যকে অসদাচরণ গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশ করতে পারবে এবং এই বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করবার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে পারবে (ধারা-২৭)।

জরিমানা কীভাবে বা কোন পদ্ধতিতে আদায় করা হবে?

কোনো জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913)-এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হবে (ধারা ২৭ এর ৪)।

আইনে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষসমূহ এবং উদাহরণ

কর্তৃপক্ষ (ধারা ২(খ) উদাহরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোনো সংস্থা .... জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সুপ্রীম কোর্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের

অধীন প্রণীত কার্যবিধিমালার অধীনে গঠিত সরকারের কোনো

মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয় .... সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ড

কোনো আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা..............দুর্নীতি দমন কমিশন গ্রামীণ ব্যাংক

প্রতিষ্ঠান

সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট.........বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন

কোনো বেসরকারি সংস্থা

বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান .... ব্র্যাক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোনো সংস্থা

বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারি কার্যক্রম

পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ....বিভিন্ন সেতুর টোল আদায়কারী সংস্থা

সরকার কর্তৃক, সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য ....নির্ধারণ করা হয়নি

কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। ■

চিত্র-৪

তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র
(বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ছক)

১. আবেদনকারীর নাম: ....

পিতার নাম: .... মাতার নাম: ....

বর্তমান ঠিকানা: ....

স্থায়ী ঠিকানা: ....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে): ....

পেশা: ....

২. কী ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন): ....

৩. কোনো পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোনো পদ্ধতি): ....

৪. তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও ঠিকানা: ....

৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা: ....

৬. তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা: ....

৭. আবেদনের তারিখ: ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর: ....

চিত্র-৫

আপিল আবেদন
(বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ছক)

১. আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা: ....
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)

২. আপিলের তারিখ: ....

৩. যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে তার কপি (যদি থাকে): ....

৪. যার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে তার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে): .....
....

৫. আপিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ....

৬. আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ): ....

৭. প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি / ভিত্তি: ....

৮. আপিলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন: ....

৯. অন্য কোনো তথ্য যা আপিল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপিলকারী ইচ্ছা প্রকাশ করেন:
....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর: ....

কিছু সফল বাস্তবায়নের চিত্র

কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না ১৯৬১ সালে এই বিধানটি বাতিল করা হয়েছে। রহিমার সন্তানরা তাদের বাবা বেঁচে থাকলে যে পরিমাণ সম্পত্তি পেতো, সেটাই পাবে। ৪৭ বছর আগে এই অধ্যাদেশ বাতিল করা হলেও এই তথ্যটি প্রচার করা হয় না বলে সাধারণ মানুষ তা জনে না এবং সব সময় প্রতারিত হচ্ছে।

২০০৯ সালের ২৯ মার্চ সংসদের প্রথম অধিবেশনেই পাস হয় 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯।' আইনটি পাস করা সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল। এই আইনের ফলে সাধারণ মানুষ সরকারি তথ্য পাওয়ার আইনি অধিকার লাভ করে।

তবে এটি ঠিক যে, শুধু আইন করা মানেই এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা নয়। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের কিছু প্রায়োগিক সমস্যা আছে। এ দেশের সরকারি দপ্তর ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংরক্ষণের হাল মোটেও ভালো নয়। তথ্য ব্যবস্থাপনার এ ত্রুটির জন্য কেউ তথ্য চাইলে যথেষ্ট ইতিবাচক মনোভাব থাকলেও কর্মকর্তারা হয়তো তা নাও দিতে পারেন। এ ছাড়া তথ্য দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত লোকও থাকে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার পরিবর্তন হয়। যে ব্যক্তি বা বিভাগ তথ্যটি দিতে পারে, তারও বদলি হতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা চাকরিস্থল বদল করতে পারেন। এছাড়া কারো কারো রয়েছে দক্ষতার অভাব, সচেতনতার অভাব। এই আইনে এসব বিষয় নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সহজ ভাষায়, আইনটিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। এর সুবিধাগুলো মানুষকে জানাতে হবে। আর এর মাধ্যমেই আইনের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। মানুষ যতোক্ষণ পর্যন্ত এই আইনের ব্যবহার করবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত এই আইন সফল হবে না।

তথ্য অধিকার আইনের আন্দোলনের সঙ্গে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন শুরু থেকেই ছিল। আর এ আন্দোলনের সঙ্গে যারা জড়িত তারা মনে করে, শুধু কাউকে হেনস্তা করার জন্য আইনটিকে ব্যবহার করা মোটেও উচিত হবে না। বরং মানুষের বাস্তব জীবনের প্রয়োজনেই এর ব্যবহার হওয়া উচিত। রাষ্ট্র কীভাবে জনগণের অর্থ ব্যয় করছে এমন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

মানুষ জানতে চাইতে পারে। লোকে যদি তথ্য না চায় তবে আমরা বুঝতে পারবো না সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য দেওয়ার বিষয়ে আন্তরিক কি না।

এখন পর্যন্ত বিশ্বের ৭৫টি দেশে তথ্য অধিকার আইন বা তথ্যের স্বাধীনতা আইন হয়েছে। এর বাস্তবায়ন একেক দেশে একেক রকম। আইনটি সেখানেই বেশি ব্যবহার হয়েছে যেখানে সুশীল সমাজ এই আইনটির বাস্তবায়নে জনচাহিদা সৃষ্টিতে আন্দোলন করেছে এবং যেখানে সরকারি কর্তৃপক্ষ ভালোভাবে সাড়া দিয়েছে। নিচে এমন কয়েকটি দেশের উদাহরণ দিচ্ছি।

ভারত

ভারতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৫ সালের মে মাসে পার্লামেন্টে পাস হয়। ওই বছরেরই জুন মাসে রাষ্ট্রপতি তাতে স্বাক্ষর করেন। অক্টোবর মাসে আইনটি কার্যকর হয়। তথ্য অধিকার আইনের ফলে সরকারি তহবিল তছরুপের অনেক ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই আইন ব্যবহার করে দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে জাতিগত কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন, আদিবাসী, দলিত, হরিজনরা অনেক দাবি আদায় করতে পেরেছে।

এরকমই একজন দাবি আদায়কারী হচ্ছেন রাজকোট জেলার রাঙ্গুরা গ্রামের এক দরিদ্র অধিবাসী রতনজি। তিনি তথ্য অধিকার আইনটি ব্যবহার করে তার গ্রামের অনেক দুর্নীতির ছবি তুলে ধরেন। তিনি দেখান, অনেক কাজ শেষ হয়ে গেছে বলে সরকারি নথিতে দেখানো হলেও আসলে তা শেষ হয়নি। আবার কোনো কাজ আদৌ হয়নি। এসব কাগজপত্র পেয়ে গ্রামবাসী আন্দোলন শুরু করে এবং ঠিকাদার 'বাবুদের' কাজ শেষ করতে বাধ্য করে। এটি একটি মাত্র উদাহরণ। ভারতে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সরকারি কর্মচারীদের ঠিকমতো কাজ করতে বাধ্য করার ঘটনা অনেকেই ঘটেছে।

মেক্সিকো

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন দেখার জন্য 'ফেডারেল অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন ইনস্টিটিউট (আইএফএআই)' নামের একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে মেক্সিকো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থাপন করেছে। মেক্সিকো সরকার 'ইনফোমেক্স' নামের ওয়েবসাইট তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে যে কেউ তথ্য চেয়ে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করতে পারে। মেক্সিকোর দক্ষিণের রাজ্য চিয়াপাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তসংলগ্ন কোয়াউইলা রাজ্য পর্যন্ত অঞ্চলের পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সুফল পেয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তনে এসব কাজের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করেই মেক্সিকোর গেরেরো রাজ্যের বিতর্কিত লা পারোটা বাঁধ প্রকল্পের বিষয়ে মানুষ জানতে পারে। এ ছাড়া আইনটি ব্যবহার করে সালটিও শহরের পানি পরিষেবা ব্যবস্থায় অনিয়ম ধরা পড়ে।

পাকিস্তান

পাকিস্তানে ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশের মাধ্যমে 'ফ্রিডম অব ইনফরমেশন আইন' জারি করা হয়। সে সময় দেশটির ক্ষমতায় ছিল সামরিক সরকার। বর্তমানে দেশটিতে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। তবে এ পর্যন্ত সরকার অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত করার জন্য পার্লামেন্টে উত্থাপন করেনি। তবে পাকিস্তানের সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতার জন্য এই অধ্যাদেশকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের বেসরকারি সংগঠন সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (সিপিডিআই) সরকারি অফিসের দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার নানা ঘটনা এই অধ্যাদেশটি ব্যবহার করেই তুলে ধরেছে। সংগঠনটি পাকিস্তানের আইন, বিচার ও মানবাধিকার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে নিচের বিষয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছে: সুপ্রিম কোর্টে ২০০২ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০০৮ সালের ২০ মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কাজ করা মন্ত্রণালয়ের নিয়োগকৃত আইনজীবীদের তালিকার কপি। এই সময়ে এসব আইনজীবীকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ফি ও অন্যান্য খাতে কতো অর্থ দেওয়া হয়েছে এরও একটি কপি। সিপিডিআই এসব নথি চাইলে মন্ত্রণালয় তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলে, এর ফলে 'প্যান্ডোরার বাক্স' খুলে যাবে। তবে সংগঠনটি তাদের তথ্য চাওয়ার দাবিতে অনমনীয় থাকে। এরপর গণমাধ্যম এ বিষয়টি দেশবাসীর নজরে আনে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন

সবাই যেন তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে

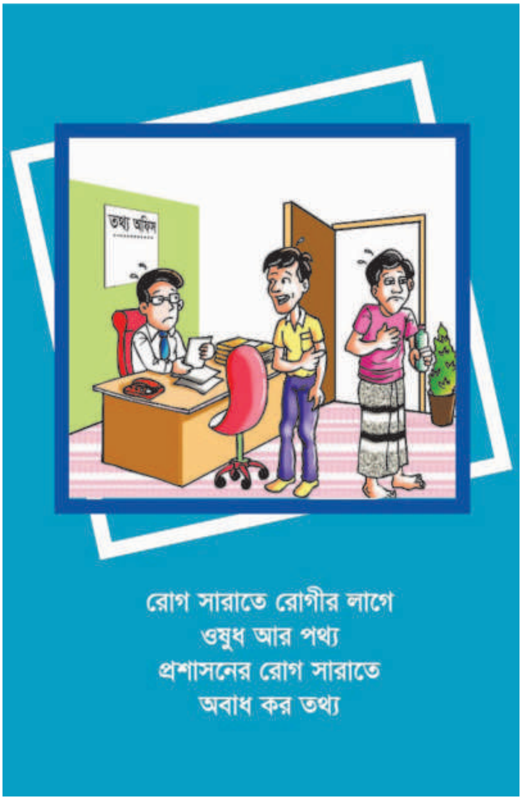

রুহি নাজ
সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ, বাংলাদেশ (আরআইবি)

তথ্য পাওয়ার সুযোগ শুধু একটি অধিকার নয়, এটা সুশাসনকে এগিয়ে নেওয়া ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কোনো নাগরিককে সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাহিদামতো তথ্য পাওয়ার অধিকার দেয় তথ্য অধিকার আইন। তথ্য অধিকার একটি সরকারকে তার উদ্যোগ, নিষ্ক্রিয়তা বা ব্যর্থতার জন্য জবাবদিহি করানোর হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়।

তথ্য অধিকারের বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে। যেমন- একটি দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এর মাধ্যমে উন্নত হতে পারে। কারণ গণতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে জনগণের মতামত। সবচেয়ে বড় সুবিধার অন্যতম হলো জনগণের ক্ষমতায়ন, যার জোরে জনগণ তাদের অধিকার দাবি করতে পারে। এ ছাড়া রয়েছে দুর্নীতি মোকাবিলা করার হাতিয়ার, যাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এবং সরকার আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারে। সরকারের এসব দায়িত্ব পূরণ করতে সক্রিয় তথ্য প্রকাশের নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ তথ্য অধিকার আইন সরকারি সংস্থাগুলোকে তাদের নিজস্ব উদ্যোগে কিছু কিছু তথ্য নিজেদের ওয়েবসাইটে তুলে দিতে বা অন্যভাবে প্রকাশ করতে চাপে রাখে।

২০০৯ সালের জুলাইয়ে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর অনেক আশা নিয়ে মানুষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিল। এই আইনকে তারা সম্ভবত বাংলাদেশের সংসদে পাস হওয়া সবচেয়ে বৈপ্লবিক আইন বলে আখ্যা দিয়েছিল। আইনটি জারি হওয়ার সময় অনেকেই একে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকারের ইঙ্গিত বলে মনে করেছিলেন। আইনটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো বেআইনিভাবে তথ্য গোপন রাখলে সরকারি কর্তৃপক্ষ ও সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর শাস্তির বিধান আছে।

তবে আইনটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রকৃতই এর কতোটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে এবং এই আইনকে ঘিরে জনগণের প্রত্যাশা এবং সরকারের অঙ্গীকার কতোটা পূরণ হয়েছে তা নিয়ে অনেক আলোচনা ও সংশয় রয়েই গেছে।

এটা আমাদের সবার জানা যে, আমরা এমন একটি সমাজে বাস করি যেখানে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি ও আমলাদের মধ্যে এখনো গোপনীয়তার সংস্কৃতি বিরাজ করছে। তথ্য অধিকার আইন আরও ভালোভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে এ সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনা দরকার। তথ্য অধিকার আইনকে নাগরিকের কাছে বাস্তব করতে হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথা সরকারি কর্তৃপক্ষকে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যখন তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কোনো আবেদন পান, তখন তাকে মনে রাখতে হবে যে, তার হাতে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা তথ্য পাওয়ার অধিকার একজন নাগরিকের রয়েছে। যারা তথ্য দেবেন (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা) তাদেরও এ বিষয়ে আরও বেশি সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা এও দেখেছি যে, কার্যকরের পর থেকে সাধারণ মানুষ, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমকর্মী, মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ কিংবা পেশাজীবী সংগঠনগুলো তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সেভাবে করেনি। শুধু দেশের সবচেয়ে অনগ্রসর কিছু মানুষ আইনটি ব্যবহার করার উদ্যোগ নিয়েছিল, তাও আবার এনজিওর সহায়তায়। এনজিওগুলো ওইসব দরিদ্র সাধারণ মানুষকে এই আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য ও এটি কাজে লাগিয়ে কীভাবে সরকারের কাছে নায্য পাওনা আদায় করা যায়, তা শিখিয়ে দিয়েছে। এনজিওগুলোর এসব নিবেদিত উদ্যোগ নিশ্চিতভাবেই জনগণের তরফ থেকে তথ্য অধিকার আইনে করা আবেদনের সংখ্যা বাড়িয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কিছুসংখ্যক এনজিওর জোরদার তৎপরতা এবং তাদের নিরলস উদ্যোগের কারণেই পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর একজন নারী সাহস পান স্থানীয় থানায় গিয়ে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মামলার তালিকা চাইতে। থানার কাছে তথ্য না পেয়ে ওই নারী তথ্য কমিশনের দরজায় গিয়েছিলেন।

এ ছাড়া দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির তথ্য অথবা আদিবাসীদের সরকারের খাস জমির তথ্য পাওয়ার উদাহরণও আছে। সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী এই আইনের মাধ্যমে তাদের অধিকারের খবর পেয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাবিও আদায় করতে পেরেছে। তাদের তথ্য চাওয়ার আবেদনের ধরনের ক্রমশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। শুরুর দিকে বেশির ভাগ আবেদন হতো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির তথ্যের জন্য। তবে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে এই আইন ব্যবহার করে সম্ভাব্য দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্যও চাওয়া হচ্ছে।

মানুষের মনে এ সচেতনতা আনা দরকার যে, তথ্য অধিকার আইন শুধু তথ্য চাওয়া আর পাওয়ার জন্য নয়। এই আইনকে বৈপ্লবিক বিবেচনা করা হয় এই ধারণা থেকে যে, দেশের অসংখ্য আইনের মধ্যে এটাই একমাত্র আইন যার মাধ্যমে সরকার ও এর প্রতিষ্ঠানগুলোর এবং এনজিওগুলোর কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব এবং এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতির সংস্কৃতি নির্মূল করা যায়। এ আইনের বদৌলতে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই জনগণের কাছে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের বিষয়ে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

এই আইন সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব পূরণের সেতু হতে পারে। সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা জনগণকে দেওয়া হয়েছে। এটি জনগণের মধ্যে মালিকানা ও ক্ষমতায়নের বোধ সৃষ্টি করার জন্য একটি অনন্য হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। আমরা আশা করতে চাই, আগামী দিনগুলোতে আমরা দেখতে পাব, সাধারণ জনগণ, সুশীল সমাজ, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ, গণমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী মহলো, বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্যের জন্য আবেদন করবে। সর্বস্তরের মানুষ আরও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এর কাঙ্ক্ষিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ

আরটিআই ফর্ম হাতে কানন মল্লিক

কানন মল্লিক বটিয়াঘাটা সদর ইউনিয়ন নজরদারি গ্রুপের একজন সক্রিয় সদস্য। বটিয়াঘাটার হাটবাটি গ্রামের বাসিন্দা কানন এ গ্রুপের আহ্বায়ক। একজন সমাজকর্মী হিসেবে তিনি নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ রোধে নিজ এলাকায় সবসময়ই সোচ্চার। নিজের নজরদারি গ্রুপকে সঙ্গে নিয়ে কানন মল্লিক 'পার্টিসিপেটরি সিলেকশন প্রসেস (পিএসপি)' বা অংশগ্রহণমূলক বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য উপজেলা সমাজসেবা দপ্তরকে ব্যাপক সমর্থন দিয়েছেন।

এক পর্যায়ে কানন তাঁর কাজের প্রয়োজনে ২০১৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর বটিয়াঘাটা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কাছে এ উপজেলার বয়স্ক ও বিধবা ভাতা গ্রহীতাদের তালিকার একটি ফটোকপি দেওয়ার আবেদন করেন। এর পর তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে একাধিকবার যোগাযোগ করেও তালিকাটির কপি পাননি। জেজেএস-এর ইউনিয়ন নজরদারি গ্রুপের একজন সদস্য হওয়ায় কানন আরটিআই আইন ও এর কার্যকারিতা সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কাছে তথ্য না পেয়ে তিনি আরটিআই আইন-২০০৯-এর (২৪-এর ৩ ধারা এবং ১ ও ২ উপধারা) আওতায় খুলনা জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালকের কাছে ২০১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে এক আবেদন করেন। একই বছর ২১ এপ্রিল তিনি তাঁর আগের আবেদনের ফটোকপি এবং বটিয়াঘাটা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রসহ আরেকটি আবেদন করেন। অভিযোগপত্রের নম্বর ৮৪/২০১৫। ২০১৫-এর ১৮ মে তথ্য কমিশনের এক বৈঠকে আলোচিত হয় বিষয়টি। বৈঠকে ১০ জুন ২০১৫ তারিখে শুনানির দিন ধার্য করে পরোয়ানা জারি করা হয়।

উভয়পক্ষের মতামত শুনে ও নথিপত্র দেখে শুনানি শেষে তথ্য কমিশন বটিয়াঘাটা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও তথ্য বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ডিও) তথ্য সরবরাহের নির্ধারিত খরচ প্রদানের ভিত্তিতে পাঁচ দিনের মধ্যে কানন মল্লিককে তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার নির্দেশ দেন। এতে আরও বলা হয়, আরটিআই আইন-২০০৯-এর ৮ ও ৯ উপধারা অনুযায়ী আদেশ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য কমিশনকে জানাতে হবে।

অবশেষে কানন মল্লিক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে তাঁর চাওয়া তথ্য পেলেন। ২০১৫-এর ২১ মে

অনুষ্ঠিত নজরদারি গ্রুপের ত্রৈমাসিক সভায় তিনি তাঁর তথ্য না পাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। ২০১৫-এর ১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত গ্রুপের পরবর্তী সভায় কানন তথ্য অধিকার আইনের প্রশংসা করেন। এ আইনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষেরা তাঁদের তথ্য পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম।

উল্লেখ্য, সরকারি সেবায় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান রূপসা প্রকল্প। এ প্রকল্পের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইউনিয়ন পর্যায়ে ২০টি নজরদারি গ্রুপ (ওয়াচ গ্রুপ) গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সংশ্লিষ্ট কর্মএলাকা থেকে স্থানীয়ভাবে বাছাই করা হয়েছে এই সদস্যদের। সরকারি সেবার ওপর জোরদার ও টেকসই নজরদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই এসব নজরদারি গ্রুপ গঠনের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে কর্মকৌশল নিয়ে আলোচনা এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করে থাকে গ্রুপগুলো।

সরকারি সেবার মান উন্নয়নের জন্য জাগ্রত যুব সংঘ (জেজেএস) জিএমএমপি নামে একটি প্রকল্প নিয়েছে। এর পুরো নাম গভর্ন্যান্স পারফর্ম্যান্স মনিটরিং প্রকল্প। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) আর্থিক সহায়তায় ২০০৭ সাল থেকে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।

আইনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষেরা তাঁদের তথ্য পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম

তথ্য প্রকাশনীতি

সরকার খুলে দিল দ্বার, দিন ফুরালো বন্ধ তালার

বরিশালের বানারীপাড়ার কৃষক মোশারেফ হোসেন মাঝি তথ্য অধিকার আইনের কথা শুনেছিলেন। তিনি শুনেছিলেন এর মাধ্যমে প্রয়োজনমত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তো, একদিন তিনি কৃষি বিষয়ক কিছু তথ্য চেয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কাছে আবেদন করলেন। কিন্তু কৃষি কর্মকর্তা তার আবেদন নিতেই রাজি হলেন না। মোশারেফ হোসেন তখন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে কৃষি কার্যালয়ে আবেদন করলেন। কিন্তু উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা উপ-পরিচালকের অনুমতি চেয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বরিশাল জেলা কার্যালয়ে আবেদন করলেন। উপ-পরিচালক তখন অতিরিক্ত পরিচালকের কাছে এবং তিনি আবার ঢাকার খামারবাড়িতে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের কাছে লিখলেন।

শেষ পর্যন্ত সদর দপ্তরের নির্দেশনাক্রমে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবেদনকারীকে জানালেন, ওই বিষয়গুলো রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য এবং সে কারণে সাধারণের কাছে প্রকাশ করা যাবে না। খুব স্বাভাবিকভাবেই ওই কর্মকর্তা সেকশন ৭-কে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এতে কিছু রাষ্ট্রীয় তথ্য না দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু মোশারেফ হোসেন মাঝি যে তথ্য চেয়েছিলেন তা ছিল সার, বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি বরাদ্দ নিয়ে। এর কোনোটিই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক নয়। কোনোভাবেই তা সেকশন ৭-এর ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে না।

আইন অনুযায়ী ওই আবেদনকারী পরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কাছে আপিল করেন। আবারও তাকে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার অজুহাত দিয়ে একই জবাব দেওয়া হলো। মোশারেফ পরে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করলেন। কমিশন একটি শুনানির আয়োজন করে এবং শুনানির পর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে তথ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কর্মকর্তা তখন আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন।

তথ্য কমিশনের কাছে দায়ের করা অভিযোগ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সেকশন ৭ অপব্যবহারের অনেক নজির আছে। তথ্য অধিকার আইন থাকা সত্ত্বেও কেন মোশারেফ মাঝি ও তার মতো অনেকে ভোগান্তির শিকার হলেন? এখানে কি আইনটি বুঝতে পারার মধ্যে কোন ফাঁকফোকর আছে? নাকি এটা প্রথাগত গোপনীয়তার সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মানসিকতার সমস্যা? তা-ই যদি হয় তাহলে কীভাবে ফাঁকফোকর ঘুচিয়ে মানসিকতার পরিবর্তন করা যায়? এ সব প্রশ্নের সম্ভবত কোনো একক জবাব নেই। তবে এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, এ আইনের বিধিবিধানগুলো আরও স্পষ্ট করা দরকার। এটা করার একটা মাধ্যম হতে পারে কিছু দিকনির্দেশনা ও তথ্য প্রকাশ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কিছু অভ্যন্তরীণ নীতি তৈরি করা। এ ভাবনাটি মাথায় রেখেই মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ওই নির্দেশিকায় থাকবে বিভিন্ন তথ্যের তালিকা। কর্তৃপক্ষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন অর্থ প্রকাশ করবে, কোন তথ্য আবেদনের ভিত্তিতে প্রকাশ করবে এবং কোন তথ্য প্রকাশ করা সেকশন ৭ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নয়- তা শ্রেণির ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করতে হবে। তথ্য প্রকাশ নীতিমালা (আইডিপি) /তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা (আইডিজি) এ ব্যাপারে বেছে নেওয়া যেতে পারে। আইডিপি// তথ্য কমিশন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে

সহযোগিতার ভিত্তিতে এমআরডিআই পাঁচটি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের জন্য আইডিপি/আইডিজি তৈরির পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ উদ্যোগকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে এ সব মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত ৪২ টি দপ্তরকে তালিকায় রাখা হয়েছে। আইডিপি ও আইডিজির লক্ষ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) আপিল কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রকাশের কাজে সহায়তা করা। পাশাপাশি তথ্য চাওয়া নাগরিকদের উপকার করাও এর লক্ষ্য। এটি কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা আইনের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতেও সহায়তা করবে। আশা করা হচ্ছে, তথ্যের চাহিদা ও সরবরাহের চেইনকে ক্রমেই বেশি করে গতিশীল করার মাধ্যমে এ ধরনের উদ্যোগগুলো জনগণের তথ্য পাওয়ার সুযোগকে এগিয়ে নিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

নিখুঁত ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য খুবই অংশগ্রহণমূলক ও আদানপ্রদানমূলক প্রক্রিয়ায় সরকারি এ সব দপ্তরের জন্য আইডিপি ও আইডিজি তৈরি করা হয়েছে। এ জন্য নিচের ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয়:

- তথ্য কমিশনের সঙ্গে অংশীদারিত্ব
- সংশ্লিষ্ট সচিব ও বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে পরিচিতিমূলক বৈঠক
- মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোর ৩ থেকে ৫ সদস্যের আইডিপি উন্নয়ন কমিটি গঠন
- তথ্য কমিশনে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কমিটি সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় বৈঠক
- আইডিপি তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দপ্তরকে পৃথকভাবে তথ্য কমিশন ও এমআরডিআই এর কারিগরি সহযোগিতা প্রদান
- আইডিপি/আইডিজি ছড়ান্ত করার জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক খসড়া পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় মতামত দেওয়া

এ সব দপ্তরের বেশির ভাগই এমআরডিআই এর কারিগরি সহায়তায় নিজ নিজ আইডিপি তৈরি করেছে। অন্যরা তৈরি করেছে আইডিজি। আইডিপির গুরুত্ব সম্পর্কে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও মুখ্য সচিবসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বিভাগীয় প্রধানদেও উপস্থিতিতে একটি উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়। আইডিপিগুলো মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ প্রক্রিয়া থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এমআরডিআই সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থাকে নিজ নিজ আইডিপি তৈরিতে সহায়তা করতে একটি গাইড বই তৈরি করেছে। এমআরডিআই-এর কার্যক্রমে আশ্বস্ত হয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তাদের ওয়েবসাইটে গাইড বইটি পোস্ট করেছে এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর জন্য নিজস্ব আইডিপি/আইডিজি তৈরি করা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছে। ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজির সুশাসনের একটি সূচক হিসেবে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দপ্তর নিজ নিজ আইডিপি/আইডিজি তৈরি করবে। বার্ষিক পারফর্ম্যান্স চুক্তির কিছু পয়েন্টের এর ওপর নির্ভর করবে। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে এ চুক্তি হয়েছে। বাকি মন্ত্রণালয়গুলো গাইড বুকটিকে ভিত্তি করে নিজস্ব আইডিপি/আইডিজি তৈরি করেছে। এমআরডিআই এসব তৈরি করতে মন্ত্রণালয়গুলোকে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছে।

এখন জোরের সঙ্গেই আশা করা হচ্ছে যে, মোশারেফ মাঝির মতো মানুষদের আর সাধারণ তথ্যের জন্য এক অফিস থেকে আরেক অফিসে ঘুরতে হবে না। তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ জেনে বা না জেনে সেকশন ৭-এর অজুহাত দিয়ে তথ্য সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানাবে না। মন্ত্রণালয়গুলোর আইডিপি/আইডিজি তথ্যের সুষ্ঠু প্রবাহে সহায়তা করবে। কোন কোন তথ্য পাওয়া সম্ভব এবং তা কোথায় কীভাবে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নেও অবদান রাখে (এম আর ডি আই)। ■

UKaid
from the British people